ছুটির পড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কর্তৃক সংকলিত

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

সূচী

ছুটির দিনে

ওই দেখো মা, আকাশ ছেয়ে
মিলিয়ে এল আলো ;
আজকে আমার ছুটোছুটি
লাগল না আর ভালো।
ঘণ্টা বেজে গেল কখন,
অনেক হল বেলা,
তোমায় মনে পড়ে গেল,
ফেলে এলেম খেলা।
আজকে আমার ছুটি, আমার
শনিবারের ছুটি।
কাজ যা আছে সব রেখে আয়—
মা, তোর পায়ে লুটি।
দ্বারের কাছে এইখানে বোস,
এই হেথা চৌকাঠ—
বল্ আমারে কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।

ওই দেখো মা, বর্ষা এল
ঘনঘটায় ঘিরে,
বিজুলি ধায় এঁকেবেঁকে
আকাশ চিরে চিরে।
দেব্‌তা যখন ডেকে ওঠে
থর্‌থরিয়ে কেঁপে

ভয় করতেই ভালোবাসি
তোমায় বুকে চেপে।
ঝুপ্‌ঝুপিয়ে বৃষ্টি যখন
বাঁশের বনে পড়ে
কথা শুনতে ভালোবাসি
ব'সে কোণের ঘরে।
ওই দেখো মা, জানলা দিয়ে
আসে জলের ছাট—
বল্‌ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।

কোন্‌ সাগরের তীরে মা গো,
কোন্‌ পাহাড়ের পারে,
কোন্‌ রাজাদের দেশে মা গো,
কোন্‌ নদীটির ধারে।
কোনোখানে আল বাঁধা তার
নাই ডাইনে বাঁয়ে ?
পথ দিয়ে তার সন্ধেবেলায়
পৌঁছে না কেউ গাঁয়ে ?
সারাদিন কি ধূ ধূ করে
শুকনো ঘাসের জমি।
একটি গাছে থাকে শুধু
ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমি ?
সেখান দিয়ে কাঠকুড়ুনি
যায় না নিয়ে কাঠ ?

বল্‌ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।

এম্‌নিতরো মেঘ করেছে
সারা আকাশ ব্যেপে,
রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে
একলা ঘোড়ায় চেপে।
গজমোতির মালাটি তার
বুকের 'পরে নাচে।
রাজকন্যা কোথায় আছে
খোঁজ পেলে কার কাছে।
মেঘে যখন ঝিলিক মারে
আকাশের এক কোণে,
দুয়োরানী-মায়ের কথা
পড়ে না তার মনে ?
দুখিনী মা গোয়ালঘরে
দিচ্ছে এখন ঝাঁট,
রাজপুত্তুর চলে যে কোন্‌
তেপান্তরের মাঠ।

ওই দেখো মা, গাঁয়ের পথে
লোক নেইকো মোটে,
রাখাল-ছেলে সকাল ক'রে
ফিরেছে আজ গোঠে।

আজকে দেখো রাত হয়েছে
দিন না যেতে যেতে,
কৃষাণেরা ব'সে আছে
দাওয়ায় মাতুর পেতে
আজকে আমি লুকিয়েছি মা,
পুঁথিপত্তর যত,
পড়ার কথা আজ বোলো না—
যখন বাবার মতো
বড়ো হব, তখন আমি
পড়ব প্রথম পাঠ—
আজ বলো মা, কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।

মুকুট

ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাজধর সেনাপতি ইশা খাঁকে বলিলেন, "দেখো সেনাপতি, আমি বার বার বলিতেছি, তুমি আমাকে অসম্মান করিয়ো না।"

পাঠান ইশা খাঁ কতকগুলি তীরের ফলা লইয়া তাহাদের ধার পরীক্ষা করিতেছিলেন। রাজধরের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, কেবল মুখ তুলিয়া ভুরু উঠাইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। আবার তখনই মুখ নত করিয়া তীরের ফলার দিকে মনোযোগ দিলেন।

রাজধর বলিলেন, "ভবিষ্যতে যদি তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাক, তবে আমি তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা মাথা তুলিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বটে!"

রাজধর তাঁহার তলোয়ারের খাপের আগা মেঝের পাথরের উপরে ঠক্ করিয়া ঠুকিয়া বলিলেন, "হাঁ।"

ইশা খাঁ বালক রাজধরের বুক-ফুলানোর ভঙ্গি ও তলোয়ারের আস্ফালন দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না, হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজধরের সমস্ত মুখ, চোখের সাদাটা পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ উপহাসের স্বরে হাসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "মহামহিম মহারাজাধিরাজকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। হুজুর, জনাব, জাঁহাপনা, শাহেন্ শা—"

রাজধর তাঁহার স্বাভাবিক কর্কশ স্বর দ্বিগুণ কর্কশ করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার—তাহা তোমার মনে নাই!"

ইশা খাঁ তীব্রস্বরে বলিলেন, "বস্। চুপ। আর অধিক কথা কহিয়ো না। আমার অন্য কাজ আছে।" বলিয়া পুনরায় তীরের ফলার প্রতি মন দিলেন।

এমন সময় ত্রিপুরার দ্বিতীয় রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার তাঁহার দীর্ঘ প্রশস্ত বিপুল বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাথা হেলাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "খাঁ-সাহেব, আজিকার ব্যাপারটা কী।"

ইন্দ্রকুমারের কণ্ঠ শুনিয়া বৃদ্ধ ইশা খাঁ তীরের ফলা রাখিয়া সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ; হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শোনো তো বাবা, বড়ো তামাশার কথা। তোমার এই কনিষ্ঠটিকে— মহারাজ-চক্রবর্তীকে জাঁহাপনা জনাব বলিয়া না ডাকিলে উঁহার অপমান বোধ হয়!" বলিয়া আবার তীরের ফলা লইয়া পড়িলেন।

"সত্য নাকি!" বলিয়া ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রাজধর বিষম ক্রোধে বলিলেন, "চুপ করো দাদা।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর, তোমাকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। জাঁহাপনা! হা হা হা হা।"

রাজধর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "দাদা, চুপ করো বলিতেছি।"

ইন্দ্রকুমার আবার হাসিয়া বলিলেন, "জনাব!"

রাজধর অধীর হইয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি নিতান্ত নির্বোধ।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া রাজধরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমার থাক্, আমি তোমার বুদ্ধি কাড়িয়া লইতেছি না।"

ইশা খাঁ কাজ করিতে করিতে আড়চোখে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "উহার বুদ্ধি সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "নাগাল পাওয়া যায় না!"

রাজধর গস্‌গস্ করিয়া চলিয়া গেলেন। চলনের দাপে খাপের মধ্যে তলোয়ারখানা ঝন্‌ঝন্ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজকুমার রাজধরের বয়স উনিশ বৎসর। শ্যামবর্ণ, বেঁটে দেহের গঠন বলিষ্ঠ। সেকালে অন্য রাজপুত্রেরা যেমন বড়ো বড়ো চুল রাখিতেন ইঁহার তেমন ছিল না। ইঁহার সোজা সোজা মোটা চুল ছোটো করিয়া ছাঁটা। ছোটো ছোটো চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দাঁতগুলি কিছু বড়ো। গলার আওয়াজ ছেলেবেলা হইতেই কেমন কর্কশ। রাজধরের বুদ্ধি অত্যন্ত বেশি এইরূপ সকলের বিশ্বাস, তাঁহার নিজের বিশ্বাসও তাই। এই বুদ্ধির বলে তিনি আপনার দুই দাদাকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করিতেন। রাজধরের প্রবল প্রতাপে বাড়িসুদ্ধ সকলে অস্থির। আবশ্যক থাক্ না থাক্ একখানা তলোয়ার মাটিতে ঠুকিয়া ঠুকিয়া তিনি বাড়িময় কর্তৃত্ব করিয়া বেড়ান। রাজবাটীর চাকর-বাকরেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া, মহারাজ বলিয়া, হাতজোড় করিয়া, সেলাম করিয়া, প্রণাম করিয়া, কিছুতে নিস্তার পায় না। সকল জিনিসেই তাঁহার হাত, সকল জিনিসই তিনি নিজে দখল করিতে চান। সে বিষয়ে তাঁহার চক্ষুলজ্জাটুকু পর্যন্ত নাই। একবার যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের একটা ঘোড়া তিনি রীতিমত দখল করিয়াছিলেন দেখিয়া যুবরাজ ঈষৎ হাসিলেন কিন্তু কিছু বলিলেন না। আর-একবার কুমার ইন্দ্রকুমারের রুপার-পাত-লাগানো একটা ধনুক অম্লানবদনে অধিকার করিয়াছিলেন; ইন্দ্রকুমার চটিয়া বলিলেন, "দেখো, যে জিনিস লইয়াছ উহা আমি আর ফিরাইয়া লইতে চাহি না, কিন্তু ফের যদি তুমি আমার জিনিসে হাত দাও তবে আমি এমন করিয়া দিব যে, ও হাতে আর জিনিস তুলিতে পারিবে না।" কিন্তু রাজধর দাদাদের কথা বড়ো গ্রাহ্য করিতেন না। লোকে তাঁহার আচরণ দেখিয়া আড়ালে বলিত, "ছোটোকুমারের রাজার ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু রাজার ছেলের মতো কিছুই দেখি না।"

কিন্তু মহারাজা অমরমাণিক্য রাজধরকে কিছু বেশি ভালো-

বাসিতেন। রাজধর তাহা জানিতেন। আজ পিতার কাছে গিয়া ইশা খাঁর নামে নালিশ করিলেন।

রাজা ইশা খাঁকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "সেনাপতি, রাজকুমারদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন উহাদিগকে যথোচিত সম্মান করা উচিত।"

"মহারাজ বাল্যকালে যখন আমার কাছে যুদ্ধশিক্ষা করিতেন, তখন মহারাজকে যেরূপ সম্মান করিতাম— রাজকুমারগণকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান করি না।"

রাজধর বলিলেন, "আমার অনুরোধ, তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়ো না।"

ইশা খাঁ বিদ্যুদ্‌বেগে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "চুপ করো, বৎস! আমি তোমার পিতার সহিত কথা কহিতেছি। মহারাজ, মার্জনা করিবেন, আপনার এ কনিষ্ঠ পুত্রটি রাজ-পরিবারের উপযুক্ত হয় নাই। ইহার হাতে তলোয়ার শোভা পায় না। এ বড়ো হইলে মুনশির মতো কলম চালাইতে পারিবে— আর কোনো কাজে লাগিবে না।"

এমন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ ও ইন্দ্রকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইশা খাঁ তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চাহিয়া দেখুন মহারাজ, এই তো যুবরাজ বটে। এই তো রাজপুত্র বটে।"

রাজা রাজধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাজধর, খাঁ-সাহেব কী বলিতেছেন। তুমি অস্ত্রবিদ্যায় উঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পার নাই?"

রাজধর বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, পরীক্ষায় যদি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ না হই তবে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। আমি রাজবাটী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, আগামী সপ্তাহে পরীক্ষা হইবে। তোমাদের মধ্যে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাকে আমার হীরক-খচিত তলোয়ার পুরস্কার দিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ ছিলেন। শুনা যায়, একবার তাঁহার এক অনুচর প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে একটা মোহর নীচে ফেলিয়া দেয়, সেই মোহর মাটিতে পড়িতে না-পড়িতে তীর মারিয়া কুমার তাহাকে শতহাত দূরে ফেলিয়াছিলেন।— রাজধর রাগের মাথায় পিতার সম্মুখে দম্ভ করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মনের ভিতর বড়ো ভাবনা পড়িয়া গেল। যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের জন্য বড়ো ভাবনা নাই— তীরছোঁড়া-বিদ্যা তাঁহার ভালো আসিত না, কিন্তু ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা দায়। রাজধর অনেক ভাবিয়া অবশেষে একটা ফন্দি ঠাওরাইলেন। হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, 'তীর ছুঁড়িতে পারি না-পারি, আমার বুদ্ধি তীরের মতো— তাহাতে সকল লক্ষ্যই ভেদ হয়।'

কাল পরীক্ষার দিন। যে জায়গাতে পরীক্ষা হইবে, যুবরাজ, ইশা খাঁ ও ইন্দ্রকুমার সেই জমি তদারক করিতে গিয়াছেন। রাজধর আসিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ পূর্ণিমা— আজ রাত্রে যখন বাঘ গোমতী নদীতে জল খাইতে আসিবে, তখন নদীতীরে বাঘ-শিকার করিতে গেলে হয় না?"

ইন্দ্রকুমার আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "কী আশ্চর্য! রাজধরের যে আজ শিকারে প্রবৃত্তি হইল! এমন তো কখনো দেখা যায় না।"

ইশা খাঁ রাজধরের প্রতি ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "উনি আবার শিকারী নন? উনি জাল পাতিয়া ঘরের মধ্যে শিকার করেন। উঁহার বড়ো ভয়ানক শিকার। রাজসভায় একটি জীব নাই যে উঁহার ফাঁদে একবার-না-একবার না পড়িয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন, কথাটা রাজধরের মনে লাগিয়াছে— ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "সেনাপতি-সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার কথাও তেমনি, উভয়ই শাণিত— যাহার উপরে গিয়া

পড়ে তাহার মর্মচ্ছেদ করে।”

রাজধর হাসিয়া বলিলেন, “না দাদা, আমার জন্য বেশি ভাবিয়ো না। খাঁ-সাহেব অনেক শান দিয়া কথা কহেন বটে, কিন্তু আমার কানের মধ্যে পালকের মতো প্রবেশ করে।”

ইশা খাঁ হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া পাকা গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন, “তোমার কান আছে নাকি। তা যদি থাকিত তাহা হইলে এতদিন তোমাকে সিধা করিতে পারিতাম!” বৃদ্ধ ইশা খাঁ কাহাকেও বড়ো মান্য করিতেন না।

ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। যুবরাজ বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ হাসি থামাইয়া তাঁহার কাছে গেলেন— মৃদুভাবে বলিলেন, “দাদা, তোমার কী মত। আজ রাত্রে শিকার করিতে যাইবে কি।”

চন্দ্রনারায়ণ কহিলেন, “তোমার সঙ্গে, ভাই, শিকার করিতে যাওয়া মিথ্যা, তাহা হইলে নিতান্ত নিরামিষ শিকার করিতে হয়। তুমি বনে গিয়া যত জন্তু মারিয়া আন, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়া কচু কাঁঠাল শিকার করিয়া আনি।”

ইশা খাঁ পরম হৃষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিলেন— সস্নেহে ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, “যুবরাজ ঠিক কথা বলিতেছেন, পুত্র। তোমার তীর সকলের আগে গিয়া ছোটে এবং নির্ঘাৎ গিয়া লাগে। তোমার সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে।”

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, “না না দাদা, ঠাট্টা নয়— যাইতে হইবে। তুমি না গেলে কে শিকার করিতে যাইবে।”

যুবরাজ বলিলেন, “আচ্ছা, চলো। আজ রাজধরের শিকারের ইচ্ছা হইয়াছে, উহাকে নিরাশ করিব না।”

সহাস্য ইন্দ্রকুমার চকিতের মধ্যে ম্লান হইয়া বলিলেন, “কেন দাদা, আমার ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া কি যাইতে নাই।”

চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সে কী কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই শিকারে যাইতেছি—"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "তাই সেটা পুরাতন হইয়া গেছে।"

চন্দ্রনারায়ণ বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার কথা এমন করিয়া ভুল বুঝিলে বড়ো ব্যথা লাগে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না দাদা, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম। শিকারে যাইব না তো কী। চলো, তার আয়োজন করি গে।"

ইশা খাঁ মনে মনে কহিলেন, 'ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সহিতে পারে, কিন্তু দাদার একটু সামান্য অনাদর সহিতে পারে না।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিকারের বন্দোবস্ত সমস্ত স্থির হইলে পরে রাজধর আস্তে আস্তে ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলাদেবীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত। কমলাদেবী হাসিয়া বলিলেন, "এ কী ঠাকুরপো, একেবারে তীরধনুক বর্ম-চর্ম লইয়া যে! আমাকে মারিবে নাকি।"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, আমরা আজ তিন ভাই শিকার করিতে যাইব, তাই এই বেশ।"

কমলাদেবী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তিন ভাই! তুমিও যাইবে নাকি। আজ তিন ভাই একত্র হইবে। এ তো ভালো লক্ষণ নয়। এ যে ত্র্যহস্পর্শ হইল।"

যেন বড়ো ঠাট্টা হইল এইভাবে রাজধর হা হা করিয়া হাসিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু বলিলেন না।

কমলাদেবী কহিলেন, "না না, তাহা হইবে না— রোজ রোজ শিকার করিতে যাইবেন আর আমি ঘরে বসিয়া ভাবিয়া মরি।"

রাজধর কহিলেন, "আজ আবার রাত্রে শিকার!"

কমলাদেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে কখনোই হইবে না। দেখিব আজ কেমন করিয়া যান।"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, এক কাজ করো, ধনুক-বাণগুলি লুকাইয়া রাখো।"

কমলাদেবী কহিলেন, "কোথায় লুকাইব।"

রাজধর। আমার কাছে দাও, আমি লুকাইয়া রাখিব।

কমলাদেবী হাসিয়া কহিলেন, "মন্দ কথা নয়। সে বড়ো রঙ্গ হইবে।" কিন্তু মনে মনে বলিলেন, 'তোমার একটা কী মতলব আছে। তুমি যে কেবল আমার উপকার করিতে আসিয়াছ তাহা বোধ হয় না।'

"এসো, অস্ত্রশালায় এসো" বলিয়া কমলাদেবী রাজধরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। চাবি লইয়া ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজধর যেমন ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি কমলাদেবী দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন। রাজধর ঘরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিলেন। কমলাদেবী বাহির হইতে হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, আমি তবে আজ আসি।" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

এ দিকে সন্ধ্যার সময় ইন্দ্রকুমার অন্তঃপুরে আসিয়া অস্ত্রশালার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কমলাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, আমাকে খুঁজিতেছ বুঝি, আমি তো হারাই নাই!" শিকারের সময় বহিয়া যায় দেখিয়া ইন্দ্রকুমার দ্বিগুণ ব্যস্ত হইয়া খোঁজ করিতে লাগিলেন। কমলাদেবী তাঁহাকে বাধা দিয়া আবার তাঁহার মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন— হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, দেখিতে কি পাও না। চোখের সম্মুখে, তবু ঘরময় বেড়াইতেছ।" ইন্দ্রকুমার কিঞ্চিৎ কাতরস্বরে কহিলেন, "দেবী, এখন বাধা দিয়ো না— আমার একটা বড়ো আবশ্যকের জিনিস হারাইয়াছে।"

কমলাদেবী কহিলেন, "আমি জানি তোমার কী হারাইয়াছে,

আমার একটা কথা যদি রাখ তো খুঁজিয়া দিতে পারি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "আচ্ছা রাখিব।"

কমলাদেবী বলিলেন, "তবে শোনো। আজ তুমি শিকার করিতে যাইতে পারিবে না। এই লও তোমার চাবি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "সে হয় না— এ কথা রাখিতে পারি না।"

কমলাদেবী বলিলেন, "চন্দ্রবংশে জন্মিয়া এই বুঝি তোমার আচরণ! একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা রাখিতে পার না?"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার কথাই রহিল। আজ আমি শিকারে যাইব না।"

কমলাদেবী। তোমাদের আর-কিছু হারাইয়াছে? মনে করিয়া দেখো দেখি।

ইন্দ্রকুমার। কই, মনে পড়ে না তো।

কমলাদেবী। তোমাদের সাত-রাজার-ধন মানিক? তোমাদের সোনার চাঁদ?

ইন্দ্রকুমার মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কমলাদেবী কহিলেন, "তবে এসো, দেখো-'সে।" বলিয়া অস্ত্রশালার দ্বারে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। কুমার দেখিলেন, রাজধর ঘরের মেঝেতে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন; দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন— "এ কী, রাজধর অস্ত্রশালায় যে!"

কমলাদেবী বলিলেন, "উনি আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "তা বটে, উনি সকল অস্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ।"

রাজধর মনে মনে বলিলেন, 'তোমাদের জিহ্বার চেয়ে নয়।' রাজধর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন।

তখন কমলাদেবী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না কুমার, তুমি শিকার করিতে যাও। আমি তোমার সত্য ফিরাইয়া লইলাম।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "শিকার করিব? আচ্ছা।" বলিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিয়া অতি ধীরে কমলাদেবীর দিকে নিক্ষেপ

করিলেন। তীর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল— কুমার বলিলেন, “আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।”

কমলাদেবী বলিলেন, “না, পরিহাস না। তুমি শিকারে যাও।”

ইন্দ্রকুমার কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ ঘরের মধ্যে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। যুবরাজকে বলিলেন, “দাদা, আজ শিকারের সুবিধা হইল না।” চন্দ্রনারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “বুঝিয়াছি।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আজ পরীক্ষার দিন। রাজবাটীর বাহিরের মাঠে বিস্তর লোক জড়ো হইয়াছে। রাজার ছত্র ও সিংহাসন প্রভাতের আলোতে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। জায়গাটা পাহাড়ে, উঁচুনিচু— লোকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, চারি দিকে যেন মানুষের মাথার ঢেউ উঠিয়াছে। ছেলেগুলো গাছের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। একটা ছেলে গাছের ডাল হইতে আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া একজন মোটা মানুষের মাথা হইতে পাগড়ি তুলিয়া আর-একজনের মাথায় পরাইয়া দিয়াছে। যাহার পাগড়ি সে ব্যক্তি চটিয়া ছেলেটাকে গ্রেফতার করিবার জন্য নিষ্ফল প্রয়াস পাইতেছে, অবশেষে নিরাশ হইয়া সজোরে গাছের ডাল নাড়া দিতেছে, ছোঁড়াটা মুখভঙ্গি করিয়া ডালের উপর বাঁদরের মতো নাচিতেছে। মোটা মানুষের দুর্দশা ও রাগ দেখিয়া সে দিকে একটা হো-হো হাসি পড়িয়া গিয়াছে। একজন এক হাঁড়ি দই মাথায় করিয়া বাড়ি যাইতেছিল, পথে জনতা দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল— হঠাৎ দেখে তাহার মাথায় হাঁড়ি নাই, হাঁড়িটা মুহূর্তের মধ্যে হাতে হাতে কত দূর চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই— দইওয়ালা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। একজন বলিল, “ভাই, তুমি দইয়ের বদলে ঘোল খাইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ লোকসান হইল বৈ তো নয়।” দইওয়ালা পরম সান্ত্বনা পাইয়া গেল। হারু নাপিতের ’পরে গাঁ-সুদ্ধ লোক চটা ছিল। তাহাকে ভিড়ের মধ্যে

দেখিয়া লোকে তাহার নামে ছড়া কাটিতে লাগিল। সে যত খেপিতে লাগিল খেপাইবার দল তত বাড়িয়া উঠিল— চারি দিকে চটাপট্ হাততালি পড়িতে লাগিল। আটাম্ন প্রকার আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল। সে ব্যক্তি মুখ চক্ষু লাল করিয়া, চটিয়া, গলদ্ঘর্ম হইয়া, চাদর ভূমিতে লুটাইয়া, একপাটি চটিজুতা ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া, বিশ্বের লোককে অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিয়া গেল। ঠাসাঠাসি ভিড়ের মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো ছেলে আত্মীয়ের কাঁধের উপর চড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। এমন কত জায়গায় কত কলরব উঠিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ নহবত বাজিয়া উঠিল। সমস্ত কোলাহল ভাসাইয়া দিয়া জয়-জয় শব্দে আকাশ প্লাবিত হইয়া গেল। কোলের ছেলে যতগুলা ছিল ভয়ে সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিল— গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় কুকুরগুলো উর্ধ্বমুখ হইয়া খেউ খেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। পাখি যেখানে যত ছিল ভয়ে গাছের ডাল ছাড়িয়া আকাশে উড়িল। কেবল গোটাকতক বুদ্ধিমান কাক সুদূরে গাম্ভারী গাছের ডালে বসিয়া দক্ষিণে ও বামে ঘাড় হেলাইয়া একাগ্রচিত্তে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিল এবং একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অসন্দিগ্ধচিত্তে কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিতে লাগিল।

রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। পাত্রমিত্র সভাসদ্গণ আসিয়াছেন। রাজকুমারগণ ধনুর্বাণ হস্তে আসিয়াছেন। নিশান লইয়া নিশানধারী আসিয়াছে। ভাট আসিয়াছে। সৈন্যগণ পশ্চাতে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজনদারগণ মাথা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে। মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পরীক্ষার সময় যখন হইল ইশা খাঁ রাজকুমারগণকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। ইন্দ্রকুমার যুবরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ তোমাকে জিতিতে হইবে, তাহা না হইলে চলিবে না।"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "চলিবে না তো কী। আমার একটা

ক্ষুদ্র তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও জগৎ-সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে। আর যদিই-বা না চলিত, তবু আমার জিতিবার কোনো সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "দাদা, তুমি যদি হার' তো আমিও ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব।"

যুবরাজ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না ভাই, ছেলেমানুষি করিয়ো না— ওস্তাদের নাম রক্ষা করিতে হইবে।"

রাজধর বিবর্ণ শুষ্ক চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইশা খাঁ আসিয়া কহিলেন, "যুবরাজ, সময় হইয়াছে, ধনুক গ্রহণ করো।"

যুবরাজ দেবতার নাম করিয়া ধনুক গ্রহণ করিলেন। প্রায় দুই শত হাত দূরে গোটা পাঁচ-ছয় কলাগাছের গুঁড়ি একত্র বাঁধিয়া স্থাপিত হইয়াছে। মাঝে একটা কচুর পাতা চোখের মতো করিয়া বসানো আছে। তাহার ঠিক মাঝখানে চোখের তারার মতো আকারে কালো চিহ্ন অঙ্কিত। সেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল। দর্শকেরা অর্ধচন্দ্র আকারে মাঠ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে— যে দিকে লক্ষ্য স্থাপিত সে দিকে যাওয়া নিষেধ।

যুবরাজ ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন। লক্ষ্য স্থির করিলেন। বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ লক্ষ্যের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ইশা খাঁ তাঁহার গোঁফ-সুদ্ধ দাড়ি-সুদ্ধ মুখ বিকৃত করিলেন, পাকা ভুরু কুঞ্চিত করিলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না। ইন্দ্রকুমার বিষণ্ণ হইয়া এমন ভাব ধারণ করিলেন যেন তাঁহাকেই লজ্জিত করিবার জন্য দাদা ইচ্ছা করিয়া এই কীর্তিটি করিলেন। অস্থিরভাবে ধনুক নাড়িতে নাড়িতে ইশা খাঁকে বলিলেন, "দাদা মন দিলেই সমস্ত পারেন, কিন্তু কিছুতেই মন দেন না।"

ইশা খাঁ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার দাদার বুদ্ধি আর-সকল

জায়গাতেই খেলে, কেবল তীরের আগায় খেলে না; তার কারণ, বুদ্ধি তেমন সূক্ষ্ম নয়।"

ইন্দ্রকুমার ভারি চটিয়া একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন। ইশা খাঁ বুঝিতে পারিয়া দ্রুত সরিয়া গিয়া রাজধরকে বলিলেন, "কুমার, এবার তুমি লক্ষ্যভেদ করো, মহারাজা দেখুন।"

রাজধর বলিলেন, "আগে দাদার হউক।"

ইশা খাঁ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "এখন উত্তর করিবার সময় নয়। আমার আদেশ পালন করো।"

রাজধর চটিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ তুলিয়া লইলেন। লক্ষ্য স্থির করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তীর মাটিতে বিদ্ধ হইল। যুবরাজ রাজধরকে কহিলেন, "তোমার বাণ অনেকটা নিকটে গিয়াছে; আর-একটু হইলে বিদ্ধ হইত।"

রাজধর অম্লানবদনে কহিলেন, "লক্ষ্য তো বিদ্ধ হইয়াছে, দূর হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না।"

যুবরাজ কহিলেন, "না, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হইয়াছে, লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নাই।"

রাজধর কহিলেন, "হাঁ, বিদ্ধ হইয়াছে। কাছে গেলেই দেখা যাইবে।" যুবরাজ আর-কিছু বলিলেন না।

অবশেষে ইশা খাঁর আদেশক্রমে ইন্দ্রকুমার নিতান্ত অনিচ্ছা-সহকারে ধনুক তুলিয়া লইলেন। যুবরাজ তাঁহার কাছে গিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "ভাই, আমি অক্ষম— আমার উপর রাগ করা অন্যায়— তুমি যদি আজ লক্ষ্যভেদ করিতে না পার, তবে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।"

ইন্দ্রকুমার যুবরাজের পদধূলি লইয়া কহিলেন, "দাদা, তোমার আশীর্বাদে আজ লক্ষ্য ভেদ করিব, ইহার অন্যথা হইবে না।"

ইন্দ্রকুমার তীর নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্য বিদ্ধ হইল। বাজনা বাজিল। চারি দিকে জয়ধ্বনি উঠিল। যুবরাজ যখন ইন্দ্রকুমারকে

আলিঙ্গন করিলেন, আনন্দে ইন্দ্রকুমারের চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল ; ইশা খাঁ পরম স্নেহে কহিলেন, "পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকো।"

মহারাজা যখন ইন্দ্রকুমারকে পুরস্কার দিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে রাজধর গিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনাদের ভ্রম হইয়াছে। আমার তীর লক্ষ্যভেদ করিয়াছে।"

মহারাজ কহিলেন, "কখনোই না।"

রাজধর কহিলেন, "মহারাজ, কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

সকলে লক্ষ্যের কাছে গেলেন। দেখিলেন, যে তীর মাটিতে বিদ্ধ তাহার ফলায় ইন্দ্রকুমারের নাম খোদিত, আর যে তীর লক্ষ্যে বিদ্ধ তাহাতে রাজধরের নাম খোদিত।

রাজধর কহিলেন, "বিচার করুন, মহারাজ।"

ইশা খাঁ কহিলেন, "নিশ্চয়ই তূণ বদল হইয়াছে।"

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, তূণ বদল হয় নাই। সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন।

ইশা খাঁ বলিলেন, "পুনর্বার পরীক্ষা করা হউক।"

রাজধর বিষম অভিমান করিয়া কহিলেন, "তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না। আমার প্রতি এ বড়ো অন্যায় অবিশ্বাস। আমি তো পুরস্কার চাই না, মধ্যমকুমার-বাহাদুরকে পুরস্কার দেওয়া হউক।" বলিয়া পুরস্কারের তলোয়ার ইন্দ্রকুমারের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমার দারুণ ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ধিক্! তোমার হাত হইতে এ পুরস্কার গ্রাহ্য করে কে। এ তুমি লও।"— বলিয়া তলোয়ারখানা ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া রাজধরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রাজধর হাসিয়া নমস্কার করিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন।

তখন ইন্দ্রকুমার কম্পিতস্বরে পিতাকে কহিলেন, "মহারাজ,

আরাকানপতির সহিত শীঘ্রই যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে গিয়া আমি পুরস্কার আনিব। মহারাজ, আদেশ করুন।"

ইশা খাঁ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কঠোরস্বরে কহিলেন, "তুমি আজ মহারাজের অপমান করিয়াছ। উঁহার তলোয়ার লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ইহার সমুচিত শাস্তি আবশ্যক।"

ইন্দ্রকুমার সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ করিয়ো না।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা বিষণ্ন হইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "পুত্র, এ কী পুত্র! আমার 'পরে এই ব্যবহার! তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হইয়াছ, বৎস।"

ইন্দ্রকুমারের চোখে জল উথলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "সেনাপতি-সাহেব, আমাকে মাপ করো, আমি আজ যথার্থই আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছি।"

যুবরাজ স্নেহের স্বরে কহিলেন, "শান্ত হও, ভাই— গৃহে ফিরিয়া চলো।"

ইন্দ্রকুমার পিতার পদধূলি লইয়া কহিলেন, "পিতা, অপরাধ মার্জনা করুন।" গৃহে ফিরিবার সময় যুবরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ আমার যথার্থই পরাজয় হইয়াছে।"

রাজধর যে কেমন করিয়া জিতিলেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না। [ক্রমশ

কাজের লোক কে

আজ প্রায় চারি শত বৎসর হইল পঞ্জাবে তলবন্দী গ্রামে কালু বলিয়া একজন ক্ষত্রিয় ব্যাবসা-বাণিজ্য করিয়া খাইতেন। তাঁহার এক ছেলে নানক। নানক কিন্তু নিতান্ত ছেলেমানুষ নহেন, তাঁহার বয়স

হইয়াছে ; এখন কোথায় তিনি বাপের ব্যাবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করিবেন তাহা নহে— তিনি আপনার ভাবনা লইয়া দিন কাটান, তিনি ধর্মের কথা লইয়াই থাকেন।

কিন্তু বাপের মন টাকার দিকে, ছেলের মন ধর্মের দিকে— সুতরাং বাপের বিশ্বাস হইল, এ ছেলেটার দ্বারা পৃথিবীর কোনো কাজ হইবে না। ছেলের দুর্দশার কথা ভাবিয়া কালুর রাত্রে ঘুম হইত না। নানকেরও যে রাত্রে ভালো ঘুম হইত তাহা নহে, তাঁহারও দিনরাত্রি একটা ভাবনা লাগিয়া ছিল।

বাবা যদিও বলিতেন ছেলের কিছু হইবে না, কিন্তু পাড়ার লোকেরা তাহা বলিত না। তাহার একটা কারণ বোধ করি এই হইবে যে, নানকের ধর্মে মন থাকাতে পাড়ার লোকের বাণিজ্য-ব্যাবসার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু বোধ করি তাহারা নানকের চেহারা, নানকের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিল। এমন-কি, নানকের নামে একটা গল্প রাষ্ট্র আছে। গল্পটা যে সত্য নয় সে আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তবে লোকে যেরূপ বলে তাহাই লিখিতেছি।

একদিন নানক মাঠে গোরু চরাইতে গিয়া গাছের তলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন ; সূর্য অস্ত যাইবার সময় নানকের মুখে রোদ লাগিতেছিল। শুনা যায় নাকি একটা কালসাপ নানকের মুখের উপর ফণা ধরিয়া রোদ আড়াল করিয়া ছিল। সে দেশের রাজা সে সময়ে পথ দিয়া যাইতেছিলেন— তিনি নাকি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা রাজার নিজের মুখে এ কথা শুনি নাই, নানকও কখনো এ গল্প করেন নাই এবং এমন পরোপকারী সাপের কথাও কখনো শুনি নাই— শুনিলেও বড়ো বিশ্বাস হয় না।

কালু অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, নানক যদি নিজের হাতে ব্যাবসা আরম্ভ করেন তবে ক্রমে কাজের লোক হইয়া উঠিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি নানকের হাতে কিছু টাকা দিলেন ; বলিয়া

দিলেন, "এক গাঁয়ে নুন কিনিয়া আর-এক গাঁয়ে বিক্রয় করিয়া আইস।" নানক টাকা লইয়া বালসিন্ধু চাকরকে সঙ্গে করিয়া নুন কিনিতে গেলেন। এমন সময় পথের মধ্যে কতকগুলি ফকিরের সঙ্গে নানকের দেখা হইল। নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন, এই ফকিরদের কাছে ধর্মের বিষয় জানিয়া লইবেন। কিন্তু কাছে গিয়া যখন তাহাদিগকে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তাহারা কথার উত্তর দিতে পারে না। তিন দিন তাহারা খাইতে পায় নাই; এমনি দুর্বল হইয়া গিয়াছে যে, মুখ দিয়া কথা সরে না। নানকের মনে বড়ো দয়া হইল। তিনি কাতর হইয়া তাঁহার চাকরকে বলিলেন, "আমার বাপ কিছু লাভের জন্য আমাকে নুনের ব্যাবসা করিতে হুকুম দিয়াছেন। কিন্তু এ লাভের টাকা কত দিনই বা থাকিবে। দুই দিনেই ফুরাইয়া যাইবে। আমার বড়ো ইচ্ছা হইতেছে, এই টাকায় এই গরিবদের দুঃখ মোচন করিয়া যে লাভ চিরদিন থাকিবে সেই পুণ্য লাভ করি।" বালসিন্ধু কাজের লোক ছিল বটে, কিন্তু নানকের কথা শুনিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। সে কহিল, "এ বড়ো ভালো কথা।" নানক তাঁহার ব্যাবসার সমস্ত টাকা ফকিরদের দান করিলেন। তাহারা পেট ভরিয়া খাইয়া যখন গায়ে জোর পাইল তখন নানককে ডাকিয়া ঈশ্বরের কথা শুনাইল। তাহারা নানককে বুঝাইয়া দিল— ঈশ্বর কেবল একমাত্র আছেন, আর সমস্ত তাঁহারই সৃষ্টি। এ-সকল কথা শুনিয়া নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল।

তাহার পরদিন নানক বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। কালু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত লাভ করিলে।" নানক বলিলেন, "বাবা, আমি গরিবদের খাওয়াইয়াছি। তোমার এমন ধন লাভ হইয়াছে যাহা চিরদিন থাকিবে।" কিন্তু সেরূপ ধনের প্রতি কালুর বড়ো একটা লোভ ছিল না। সুতরাং তিনি রাগিয়া ছেলেকে মারিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সে প্রদেশের ক্ষুদ্র রাজা পথ দিয়া যাইতেছিলেন।

তাঁহার নাম রায়বোলার। নানককে মারিতে দেখিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে। এত গোল কেন।" যখন সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন তখন তিনি কালুকে খুব তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, "আর যদি কখনো নানকের গায়ে হাত তোল তো দেখিতে পাইবে।" এমন-কি, রাজা অত্যন্ত ভক্তির সহিত নানককে প্রণাম করিলেন। লোকে বলে যে, যখন সাপ নানককে ছাতা ধরিয়াছিল তখন রাজা তাহা দেখিয়াছিলেন, এইজন্যই নানকের উপর তাঁহার এত ভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে সাপের ছাতা-ধরা সমস্তই গুজব— আসল কথা, নানকের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নানক একজন মস্ত লোক। নানকের উপর আর তো মারধোর চলে না, কালু অন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন।

জয়রাম নানকের ভগ্নীপতি। পাঠান দৌলত খাঁর শস্যের গোলা জয়রামের জিম্মায় ছিল। কালু স্থির করিলেন নানককেও জয়রামের কাজে লাগাইয়া দিবেন— তাহা হইলে ক্রমে নানক কাজের লোক হইয়া উঠিবেন। নানকের বাপ যখন নানকের কাছে এই প্রস্তাব করিলেন তখন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা।"

নানক সুলতানপুরে জয়রামের কাছে গিয়া উপস্থিত। সেখানে দিনকতক বেশ কাজ করিতে লাগিলেন। সকলের 'পরেই তাঁহার ভালোবাসা ছিল, এইজন্য সুলতানপুরের সকলেই তাঁহাকে ভালো-বাসিতে লাগিল। কিন্তু কাজে মন দিয়া নানক তাঁহার আসল কাজটি ভুলেন নাই। তিনি ঈশ্বরের কথা সর্বদাই ভাবিতেন।

এমন কিছুকাল কাটিয়া গেল। একদিন সকালে নানক একলা বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে একজন মুসলমান ফকির আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "নানক, তুমি আজকাল কী লইয়া আছ, বলো দেখি। এই-সকল কাজকর্ম ছাড়িয়া দাও। চিরদিনের যে যথার্থ ধন তাহাই উপার্জনের চেষ্টা করো।" ফকির

যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে, পৃথিবীর ভালো করো, ঈশ্বরে মন দাও— টাকা রোজগার করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ার চেয়ে ইহাতে বেশি কাজ দেখে।

ফকিরের এই কথাটা হঠাৎ এমনি নানকের মনে লাগিল যে, তিনি চমকিয়া উঠিলেন, ফকিরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন ও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্ছা ভাঙিতেই তিনি গরিব লোকদিগকে ডাকিলেন ও শস্য যাহা-কিছু ছিল সমস্ত তাহাদিগকে বিলাইয়া দিলেন। নানক আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না। কাজ-কর্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তিনি পলাইয়া গেলেন।

নানক পলাইলেন বটে, কিন্তু অনেক লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। যাঁহার ধর্মের দিকে টান, এমন মধুর ভাব, এমন মহৎ স্বভাব, তিনি সকলকে ছাড়িলেও তাঁহাকে সকলে ছাড়ে না। মর্দানা তাঁহার সঙ্গে গেল; সে ব্যক্তি বীণা বাজাইত, গান গাহিত। লেনা তাঁহার সঙ্গে গেল। সেই-যে পুরানো চাকর বালসিন্ধু ছেলেবেলায় নানকের সঙ্গে লুন বিক্রয় করিয়া টাকা লাভ করিতে গিয়াছিল, আজ সেও নানকের সঙ্গে চলিল। এবারেও বোধ করি কিঞ্চিৎ ধনলাভের আশা ছিল, কিন্তু যে-সে ধন নয়, সকল ধনের শ্রেষ্ঠ যে ধন সেই ধর্ম। রামদাসও নানককে ছাড়িতে পারিল না— তাহার বয়স বেশি হইয়াছিল বলিয়া সকলে তাহাকে বলিত বুড্‌ঢা। আর কত নাম করিব, এমন ঢের লোক সঙ্গে গেল।

নানক যথাসাধ্য সকলের উপকার করিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। হিন্দু-মুসলমান সকলকেই তিনি ভালোবাসিতেন। হিন্দুধর্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন, মুসলমানধর্মের যাহা দোষ ছিল, তাহাও তিনি বলিতেন। অথচ হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। নানক আমাদের বাংলাদেশেও আসিয়াছিলেন। শিবনাভু বলিয়া কোন্ এক দেশের রাজা নানা লোভ দেখাইয়া নানককে উচ্ছন্ন দিবার চেষ্টা

করিয়াছিলেন। কিন্তু নানক তাহাতে ভুলিবেন কেন। উলটিয়া তিনি রাজাকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিলেন। মোগল-সম্রাট বাবরের সঙ্গে একবার নানকের দেখা হয়। সম্রাট নানকের সাধুভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর টাকা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নানক তাহা লইলেন না। তিনি বলিলেন, "যে জগদীশ্বর সকল লোককে অন্ন দিতেছেন, অনুগ্রহ ও পুরস্কার আমি তাঁহারই কাছ হইতে চাই, আর কাহারো কাছে চাই না।" নানক যখন মক্কায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তখন একদিন তিনি মসজিদের দিকে পা করিয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাহা দেখিয়া একজন মুসলমানের বড়ো রাগ হইল। সে তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল, "তুমি কেমন লোক হে! ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে পা করিয়া তুমি ঘুমাইতেছ!" নানক বলিলেন, "আচ্ছা ভাই, জগতের কোন্ দিকে ঈশ্বরের মন্দির নাই একবার দেখাইয়া দাও দেখি।" নানক লোক ভুলাইবার জন্য কোনো আশ্চর্য কৌশল দেখাইয়া কখনো আপনাকে মস্ত লোক বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন নাই। গল্প আছে, একবার কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল, "আচ্ছা, তুমি তো একজন মস্ত সাধু— আমাদিগকে একটা কোনো আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা দেখাও দেখি।" নানক বলিলেন, "তোমাদিগকে দেখাইবার যোগ্য আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল পবিত্র ধর্মের কথা জানি, আর কিছুই জানি না। ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অস্থায়ী।"

নানক অনেক দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থ হইলেন। গৃহে থাকিয়া তিনি সকলকে ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি কোরান-পুরাণ কিছুই মানিতেন না। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিতেন, "এক ঈশ্বরকে পূজা করো, ধর্মে মন দাও, অন্য সকলের দোষ মার্জনা করো, সকলকে ভালোবাসো।" এইরূপে সমস্ত জীবন ধর্মপথে থাকিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া সত্তর বৎসর বয়সে নানকের মৃত্যু হয়।

কালু বেশি কাজের লোক ছিলেন কি কালুর ছেলে নানক বেশি কাজের লোক ছিলেন আজ তাহা হিসাব করিয়া দেখিব। আজ যে শিখজাতি দেখিতেছ, যাহাদের সুন্দর আকৃতি, মহৎ মুখশ্রী, বিপুল বল, অসীম সাহস দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়, এই শিখজাতি নানকের শিষ্য। নানকের পূর্বে এই শিখজাতি ছিল না। নানকের মহৎ ভাব ও ধর্মবল পাইয়া এমন একটি মহৎ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। নানকের ধর্মশিক্ষার প্রভাবেই ইহাদের হৃদয়ের তেজ বাড়িয়াছে, ইহাদের শির উন্নত হইয়াছে, ইহাদের চরিত্রে ও ইহাদের মুখে মহৎ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালু যে টাকা রোজগার করিয়াছিলেন, নিজের ভোগেই তাহা খরচ করিয়াছেন, আর নানক যে ধর্মধন উপার্জন করিয়াছিলেন আজ চারশো বছর ধরিয়া মানবেরা তাহা ভোগ করিতেছে। কে বেশি কাজের লোক বলো দেখি।

সূর্যের কথা

সূর্যের সম্বন্ধে কোনো কথা বলিতে গেলে তোমরা বোধ করি রাগ করিবে। বলিবে, আমরা কি জানি না যে সূর্য পৃথিবী হইতে অনেক দূরে, সূর্য পৃথিবী হইতে অনেক বড়ো, ইত্যাদি। কিন্তু একটু ধৈর্য ধরিয়া দেখিলে, সব কথা নিতান্ত পুরাতন ঠেকিবে না।

সকলেই জানে বটে যে, সূর্য পৃথিবী হইতে সাড়ে চার কোটি ক্রোশের চেয়েও বেশি দূরে আছে কিন্তু সে কেবল জানাই সার। একশো দুইশো ক্রোশ যে কতখানি তাহাই আমাদের মনে ভালো আয়ত্ত হয় না তো চার কোটি ক্রোশ। এখান হইতে সূর্যে পৌঁছিতে কতক্ষণ সময় লাগে তাহার একটা উদাহরণ দিলে তবু কতকটা বুঝা যাইবে। মনে করো, যে রেলগাড়ি ঘণ্টাপিছু ত্রিশ ক্রোশ করিয়া চলে অর্থাৎ দুই মিনিটে এক ক্রোশ করিয়া যায়, এইরূপ গাড়িতে

চড়িয়া তুমি যদি ১৭১ বৎসর আগে পৃথিবী হইতে যাত্রা করিতে, তবে আজ তুমি সূর্যের নিকট যাইতে পারিতে।

সূর্যের কাছে গেলে তাহাকে কত বড়ো দেখিতে? আনাক্সাগোরস নামক গ্রীস দেশের একজন পণ্ডিত পিলপনিসস প্রদেশ অপেক্ষা সূর্যকে বৃহৎ বলায় গ্রীস দেশের লোকেরা তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিল। পিলপনিসস গ্রীস দেশের একটি অংশ। কিন্তু তাহারা যদি শুনিত যে সূর্য সমস্ত গ্রীস দেশ অপেক্ষা কেন, পৃথিবী অপেক্ষা দশ লক্ষ গুণ বড়ো তাহা হইলে তাহারা না জানি কী বলিত। পৃথিবী
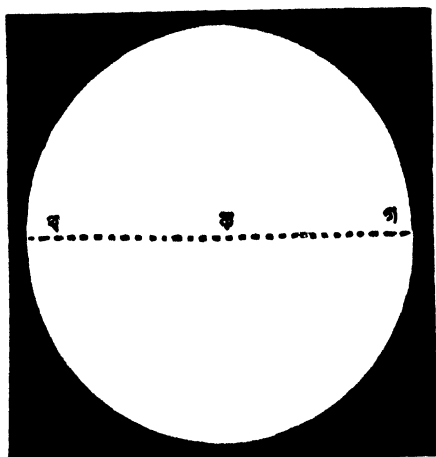
এত বড়ো যে, আমাদের বাংলাদেশ তাহার উপরে ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো। একটি দ্রুতগামী রেলগাড়িতে উঠিলে পৃথিবীর চারি ধারে ঘুরিতে এক মাস কাল লাগে। আমাদের দেশ পৃথিবীর নিকট এক বিন্দুর ন্যায়, কিন্তু সূর্যের নিকট পৃথিবীর আয়তন কিছু নহে। কারণ পৃথিবীর ব্যাস চার হাজার ক্রোশ এবং সূর্যের ব্যাস চার লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ক্রোশ। সূর্যকে এবং পৃথিবীকে যদি তরমুজের মতো মাঝামাঝি দুইখানি করিয়া কাটা যায় ও পৃথিবীর কাটা দিকটা সূর্যের কাটা দিকের উপর রাখা যায়, তাহা হইলে এমন ১০৬ খানা পৃথিবী সার

বাঁধিয়া রাখিলে তবে সূর্যের ব্যাসরেখা পূর্ণ হয়। ছবিতে ঐ যে সূর্যের পেটের উপরে পুঁতির মালার মতো আঁকা আছে, উহার এক-একটি পুঁতি অর্থাৎ এক-একটি বিন্দু এক-একটি পৃথিবী। ঐ মালায় ১০৬টি পৃথিবী আছে। সূর্যের সমস্ত আয়তন কত বড়ো যদি জানিতে চাও তাহা হইলে তাহাকে একটা ফাঁপা গোলার মতো মনে করো এবং তার পর দেখো কতগুলি পৃথিবী হইলে তাহার পেট ভরে। দশ লক্ষ একত্রিশ হাজারটা পৃথিবী ইহার মধ্যে অক্লেশে ধরিতে পারে। আমাদের পেটে এতগুলো তিল ধরে কি না সন্দেহ।

সূর্য যে কত বড়ো তাহা বুঝিলাম। কিন্তু ইহার আলোক ও উত্তাপের পরিমাণ যে কত তাহা মনে ধারণা করা এক প্রকার অসম্ভব। মনে করিয়া দেখো সূর্যের সমস্ত কিরণের মধ্যে কত অল্পটুকুই আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপর পড়িতেছে, অথচ বৈশাখ মাসে ইহাই আমাদের কাছে কী প্রখর বোধ হয়। ঘরের মধ্যে যে প্রদীপ জ্বলিতেছে তাহার আলোক চারি ধারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র এক সরিষা আনিয়া প্রদীপের কিছু দূরে ধরিলে কতটুকু আলো সেই সরিষার উপরে পড়ে তুলনা করিলে আমাদের পৃথিবীর উপরেও ততটুকুই সূর্যের আলো পড়ে এবং তাহাতেই পৃথিবীর সমস্ত কার্য চলিয়া যায়। সূর্যকিরণের প্রখরতা যদি পরীক্ষা করিতে চাও তাহা হইলে আতশ কাঁচের সাহায্যে সহজে করিতে পারো। আতশ কাঁচ সূর্যের সম্মুখে ধরিলে তাহার কিরণ সেই কাঁচের মধ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া বিন্দু-আকারে মিলিত হয়, সেই জায়গায় এক টুকরা কাগজ রাখিলে তাহা জ্বলিয়া উঠে। তবু সূর্যকিরণের সমস্ত দৌরাত্ম্য আমাদিগকে সহিতে হয় না। সূর্যের উত্তাপে জলের কণা বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাতে করিয়া বাতাস অনেকটা ঠাণ্ডা রাখে, তাহা না হইলে সূর্যকিরণের জ্বালায় পৃথিবীতে আমাদের টেঁকা দায় হইত।

সাহসের পুরস্কার

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নাম তোমরা সকলে শুনিয়াছ। তিনি একসময়ে ইংরেজের দেশ আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। যখন যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতেছে তখন কী গতিকে একজন ইংরেজি জাহাজের গোরা ফরাসি সৈন্যদের কাছে ধরা পড়ে। শত্রুপক্ষের লোক দেখিয়া ফরাসিরা তাহাকে নিজের দেশে ধরিয়া আনিয়া সমুদ্রের ধারে ছাড়িয়া দেয়। সে বেচারা একা একা সমুদ্রের ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত। দেশে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিত। সমুদ্রের পরপারেই তাহার স্বদেশ। সে সমুদ্রও কিছু বেশি বড়ো নয়। এমন-কি, এক-একদিন হয়তো মেঘ কাটিয়া গেলে, রোদ উঠিলে, ইংলণ্ডের সাদা সাদা পাহাড়ের রেখা নীল সমুদ্রের উপর মেঘের মতো দেখা যাইত। সে আকাশে চাহিয়া দেখিত, গর্মির দিনে কত ছোটো ছোটো পাখি পাখা তুলিয়া ইংলণ্ডের দিকে উড়িয়া যাইতেছে।

একদিন রাত্রে ঝড় হইয়া গেলে পর সকালে উঠিয়া সে দেখে, একটি পিপে সমুদ্রের ঢেউয়ে ডাঙার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। সেই পিপেটি লইয়া সে একটি পাহাড়ের গর্তের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। সমস্ত দিন ধরিয়া বসিয়া বসিয়া সেই পিপেটি ভাঙিয়া সে নৌকা বানাইত। কিন্তু সে গরিব, নৌকা বানাইবার সরঞ্জাম কোথায় পাইবে। সে সেই ভাঙা কাঠের চারি দিকে নরম গাছের ডাল বুনিয়া এক প্রকার নৌকার মতো গড়িয়া তুলিল। দেশের জন্য এমনই তাহার প্রাণ আকুল হইয়াছে যে, সে একবার বিবেচনা করিল না যে এ নৌকা সমুদ্রের জলে একদণ্ড টিঁকিতে পারিবে না। যাহা হউক, সেই নৌকাটি লইয়া যখন সে সমুদ্রে ভাসাইতেছে এমন সময় ফরাসি সৈন্যরা তাহাকে দেখিতে পাইল। ফরাসিরা

তাহাকে ধরিল। বেচারার এত কষ্টের নৌকা ভাসানো হইল না— এত দিনের আশা নির্মূল হইল।

এই কথা কী করিয়া নেপোলিয়নের কানে উঠিল। নেপোলিয়ন সমুদ্রের ধারে গিয়া সমস্ত দেখিলেন। তিনি সেই ইংরেজ বালককে বলিলেন, "তোমার এ কিরকম সাহস। এই খানকতক কাঠ আর গাছের ডাল্‌ বেঁধে তুমি সমুদ্র পার হতে চাও? দেশে তোমার কেই-বা আছে।"

সেই ইংরেজ বলিল, "আমার মা আছেন। আমার মাকে অনেক দিন দেখি নি, মাকে দেখবার জন্য প্রাণ বড়ো আকুল হয়েছে।" বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল।

নেপোলিয়ন তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আচ্ছা, মায়ের সঙ্গে তোমার দেখা হবে, আমি দেখা করিয়ে দেব। যে ছেলে এমন সাহসী তার মা না-জানি কত মহৎ।"

নেপোলিয়ন তাহাকে একটি মোহর দিলেন এবং নিজের জাহাজে করিয়া তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। দুঃখে পড়িলেও সেই মোহরটি সে কখনো ভাঙায় নাই, নেপোলিয়নের দয়া মনে রাখিবার জন্য সেই মোহরটি সে চিরদিনই কাছে রাখিয়াছিল।

দার্জিলিং-যাত্রা

যখন তিনটার সময় শিয়ালদহে দার্জিলিঙের গাড়িতে উঠিলাম তখন আমার মনে বড়ো আনন্দের উদয় হইল। উঁচু জায়গার মধ্যে— মানিকতলার খাল কাটার সময়ে মাটি জমা হইয়াছিল, তাহাই দেখিয়াছি। আর অত্যন্ত মোটা রামশঙ্কর কামারকে পাড়ার লোকেরা পর্বত্‌ বলিয়া থাকে, তাহাকেও দেখিয়াছি— ইহা হইতে হিমালয়ের ভাব যতটা পাওয়া যায় তাহা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু

এবার স্বয়ং হিমালয়ে সশরীরে যাইতেছি, হিমালয় পর্বত সশরীরে স্বচক্ষে দেখিব, এ কথা যতই মনে হইতে লাগিল, আনন্দে আমার বক্ষস্থল হিমালয় অপেক্ষা ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

সন্ধ্যা সাতটার সময় দামুকদিয়া স্টেশনে পৌঁছিলাম। দার্জিলিং-যাত্রীদের এই স্টেশনে নামিতে হয় এবং পদ্মানদী পার হইয়া অন্য এক ট্রেনে চড়িতে হয়। আমরা যখন এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম তখন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। জাহাজে উঠিলাম। নদী পার হইতে পনেরো মিনিটের কিছু বেশি লাগে। পার হইয়া দেখি যে, সারাঘাট স্টেশনে অন্য এক ট্রেন প্রস্তুত আছে। তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম। এখানকার গাড়িগুলি ছোটো ছোটো। ট্রেনের ঝাঁকানিতে আমার বেশ নিদ্রা হয়, সুতরাং রাত্রিটি বেশ কাটিয়া গেল। ভোর ছয়টার কিছু পূর্বে স্টেশনে গাড়ি থামিল। আমরা চা পান করিয়া লইলাম। এক ঘণ্টা পরে শিলিগুড়ি স্টেশনে গাড়ি থামিল। এই স্থান হইতে কলের ট্রামগাড়িতে চড়িয়া পাহাড়ে উঠিতে হয়। এখানে দিব্য আহারের স্থান আছে। ট্রামগাড়ি প্রস্তুত আছে, তাহাতে চড়িলাম। এ স্থানের ট্রামগাড়িগুলি নূতন ধরনের, খান-আঠারো গাড়ির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলি চতুর্দিকে শার্সি দ্বারা ঢাকা, বাকি কতকটা চিৎপুর রোডের ট্রাম-গাড়ির মতো ফাঁকা। এই ফাঁকা গাড়িতে চড়িলে চারি দিকের দৃশ্য বেশ ভালো দেখা যায়, সুতরাং আমরা তাহাতেই বসিলাম। শিলিগুড়িতে পৌঁছিয়া যাত্রীদের গরম কাপড় পরিতে হয়। আমি কাপড় ছাড়িলাম। ট্রামগাড়ি ছাড়িল। চারি দিকে ধানের ক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে চা-ক্ষেত্রের সুন্দর শোভা দেখিতে দেখিতে গাড়ি পাহাড়ের নীচে আসিল। এইবার পাহাড়ের উপরে উঠিতে আরম্ভ করা গেল। ঘন এক শালবনের মধ্য দিয়া গাড়ি চলিয়াছে, চারি দিকে বড়ো বড়ো শালগাছ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। কতক্ষণ পরে গাড়ি ঘুরিয়া এক ফাঁকা জায়গায় আসিল ; তখন নীচের দিকে

চাহিয়া দেখি, আমরা পাহাড়ের উপরে। কখনো দক্ষিণে প্রকাণ্ড পাহাড়, বামে খদ, কখনো-বা দক্ষিণে খদ ও বামে পাহাড়। ট্রামের রাস্তা মস্ত সাপের মতো পাহাড়কে ঘিরিয়া অল্প অল্প উচ্চ হইয়া উপরে উঠিয়াছে। এরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে চলিলাম। মাঝে মাঝে স্টেশন আছে। প্রথম স্টেশন তিনদরিয়া শিলিগুড়ি হইতে নয় ক্রোশ, এখানে ট্রেন পনেরো মিনিট থাকে। তিনদরিয়া হইতে যখন গাড়ি ছাড়িল তখন চতুর্দিকে মেঘ ঘন কুয়াশার মতো সাদা হইয়া চারি দিক ঘিরিয়া রহিয়াছে। মেঘের ভিতর দিয়া গাড়ি চলিতে লাগিল। আশেপাশের ঘরবাড়ি ছাড়া দূরের কিছু দেখা যায় না, সমস্ত মেঘে ঢাকা। এক ক্রোশ উপরে যখন গাড়ি উঠিল, তখন ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বৃষ্টি হইতেছে, মেঘ ঈষৎ কাটিয়া আসিতেছে; নীচের পাহাড়ে চাহিয়া দেখি, সেখানে দিব্য রৌদ্র ফুট্‌ফুট্‌ করিতেছে। এইরূপ আশ্চর্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনে হইল, পৃথিবী ছাড়িয়া উপরে স্বর্গের পথে যাইতেছি। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে গয়াবাড়ি স্টেশনে পৌঁছিলাম। এখান হইতে গাড়ি ছাড়িলে নীচের পাহাড়ে কতকগুলি চা-ক্ষেত্র দেখা যায়। দূর হইতে চা-ক্ষেত্রগুলি অতি সুন্দর দেখায়; মনে হয়, কে যেন পাহাড়ের গায়ে ছোটো ছোটো সবুজ ফোঁটা পরাইয়া দিয়াছে। তার পর আমরা কার্সিয়ং স্টেশনে পৌঁছিলাম। পূর্বে এ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়েপল্লী ছিল মাত্র, কিন্তু ক্রমে পাহাড়ের সমস্ত স্টেশনের মধ্যে একটি প্রধান শহর হইয়া দাঁড়াইতেছে। কার্সিয়ং ৪৫০০ ফিট উচ্চ। যখন এখানে পৌঁছিলাম তখন আমি শীতে কাঁপিতেছি।

এর পর সোনাদহ স্টেশন একটি ক্ষুদ্র পল্লী; কতকগুলি অপরিষ্কার বাজার দেখা যায় মাত্র। এখান হইতে ছাড়িয়া ঘুম স্টেশনে পৌঁছানো গেল। অনেকে বলেন যে পৃথিবীর কোনো পাহাড়ের উপর এত উচ্চে রেলগাড়ি যায় নাই। ইহা ৭৪০০ ফিট উচ্চ। দার্জিলিং এই স্থান হইতে দুই ক্রোশ নীচে, সুতরাং গাড়ি

নীচে নামিতে আরম্ভ করিল। নামিবার সময় দক্ষিণ দিকে 'জলা' পাহাড়ের উপরে সৈন্যদের বারিক অল্প অল্প দেখিতে পাওয়া যায় এবং বামে অনেক দূরে 'টঙ্গুলু' পর্বত ও হিমালয়ের শৃঙ্গ 'সিঙ্গলীলা' এবং নিকটে সারি সারি অনেক চা-ক্ষেত্র দেখা যায়। এক ক্রোশ নীচে যখন গাড়ি নামিল তখন দূর হইতে দার্জিলিঙের ছোটো ছোটো সাদা সাদা বাড়িগুলি পাহাড়ের গায়ে ছবির মতো বোধ হইতে লাগিল। এইরূপ মেঘ বৃষ্টি রৌদ্রের মধ্য দিয়া পাহাড় নদী নির্ঝর এবং নানাপ্রকার মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দার্জিলিঙে আসিয়া পৌঁছিলাম। শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং চব্বিশ ক্রোশ এবং সেখান হইতে দার্জিলিং পৌঁছিতে ছয় ঘণ্টা লাগে। এই ছয় ঘণ্টা যে কী সুন্দররূপে অতিবাহিত হয় তাহা লিখিয়া বর্ণনা করিতে আমি একেবারে অক্ষম। বেলা দশটার সময় শিলিগুড়ি ছাড়িয়া বৈকালে চারিটার সময় দার্জিলিং পৌঁছিলাম।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

দিনের আলো নিবে এল,
সুয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে,
রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা
বাজল ঠঙ্ ঠঙ্।
ও পারেতে বিষ্টি এল,
ঝাপ্সা গাছপালা।

এ পারেতে মেঘের মাথায়
একশো মানিক জ্বালা !
বাদ্‌লা হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান।"

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
কোথায় বা সীমানা।
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়,
কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে
বিষ্টি দিয়ে যায়।
পলে পলে নতুন খেলা
কোথায় ভেবে পায়।
মেঘের খেলা দেখে কত
খেলা পড়ে মনে—
কতদিনের লুকোচুরি
কত ঘরের কোণে।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান।"

মনে পড়ে, ঘরটি আলো
মায়ের হাসিমুখ,

মনে পড়ে, মেঘের ডাকে
গুরু গুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে
ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের 'পরে দৌরাত্মি সে
না যায় লেখাজোকা।
ঘরেতে তুরন্ত ছেলে
করে দাপাদাপি।
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে,
সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে
শুনেছিলেম গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান!"

মনে পড়ে সুয়োরানী
তুয়োরানীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী
কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে
মিটি মিটি আলো,
চারি দিকে দেয়ালেতে
ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে
একেবারে চুপ।

তারি সঙ্গে মনে পড়ে
মেঘলা দিনের গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান!"

কবে বিষ্টি পড়েছিল,
বান এল সে কোথা।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল
কবেকার সে কথা।
সেদিনো কি এমনিতরো
মেঘের ঘটাখানা।
থেকে থেকে বিজুলি কি
দিতেছিল হানা।
তিন কন্যে বিয়ে ক'রে
কী হল তার শেষে।
না জানি কোন্ নদীর ধারে,
না জানি কোন্ দেশে,
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে
কে গাহিল গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান!"

বীরজননী

ওয়াশিংটনের মাতা গৃহকর্ত্রী ছিলেন ও তাঁহার কর্তৃত্ব গৃহের মধ্যে অক্ষুণ্ণ অটল ছিল ; গৃহের মধ্যে পরিপাটি শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। মাতার নিকট শিশুসন্তান যেরূপ প্রশ্রয় পাইয়া থাকে, যেরূপ আবদার পাইয়া থাকে, তাহা ওয়াশিংটন পাইয়াছিলেন— কিন্তু তাঁহার সহিত সংযম ও আত্মসংবরণেরও শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা কোনো বৈধ শৈশবসুলভ আমোদ-আহ্লাদ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতেন না, কিন্তু কিছুই অতিরিক্ত করিতে দিতেন না। এইরূপে আমেরিকার ভাবী কর্তৃপুরুষ মাতার নিকট আজ্ঞাপালনের শিক্ষা পাইয়া আজ্ঞা দিবার অধিকারের উপযুক্ত হইয়াছিলেন। ওয়াশিংটনের মাতা পুত্রকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াও গুরুজনসুলভ কর্তৃত্ব ছাড়েন নাই। এমন-কি, ওয়াশিংটন যখন প্রখ্যাত বড়োলোক হইয়া উঠিলেন তখনো তাঁহার মাতা নিজ কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করেন নাই। সেই কর্তৃত্ব যেন এইরূপভাবে বলিত— 'আমি তোমার মাতা, আমি তোমাকে পদচালনা করিতে শিখাইয়াছি— আমার মাতৃস্নেহ তোমার ভালোবাসা আকর্ষণ করিয়াছে, আমার কর্তৃত্ব তোমার উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিয়াছে— এখন তোমার যতই যশ কীর্তি হউক-না কেন, তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি আমার প্রতি প্রযোজ্য।'

ওয়াশিংটনও তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত এই কথা রক্ষা করিয়াছিলেন।

ওয়াশিংটনের একজন শৈশব-সহচর ওয়াশিংটনের মাতৃগৃহের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন— "আমি ওয়াশিংটনের সহপাঠী ও খেলার সাথী ছিলাম। আমি ওয়াশিংটনের মাতাকে যেরূপ ভয় করিতাম সেরূপ ভয় আমার নিজের মাতা-পিতাকেও করিতাম না। তিনি খুব দয়ালু ছিলেন। তাঁহার অজস্র দয়ার মধ্যে থাকিয়াও তাঁহাকে দেখিলে

কেমন একটা সমীহ হইত। এখন তো আমার চুল পাকিয়াছে— আমার নাতিপুতি হইয়াছে, তবু যদি এখন আমি তাঁহাকে হঠাৎ দেখিতে পাই, আমার মনে কেমন একরকম অবর্ণনীয় ভাব উপস্থিত হয়। আমেরিকার পিতৃস্থানীয় ওয়াশিংটনকে দেখিলে যেমন ভয়মিশ্র ভক্তিভাবের উদয় হয়, সেইরূপ তাঁহার গৃহকর্ত্রী গৃহলক্ষ্মী মাতাকে দেখিলে সেই প্রকার ভাবের উদয় হইত।"

এই প্রকার গার্হস্থ্য শক্তির অধীনে থাকিয়া ওয়াশিংটনের মন গঠিত হইয়াছিল।

যখন ওয়াশিংটন আমেরিক-সৈন্যের প্রধান সেনাপতি-পদে নিযুক্ত হইলেন তখন সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বেই তাঁহার মাতাকে বিপদ-আপদ হইতে দূরে ও আত্মীয়স্বজনের নিকটে রাখিবার জন্য একটি গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার মাতা সেই বিপ্লবের সময়ে সেই গ্রামে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দূতেরা কখনো জয়ের সংবাদ আনিতেছে, কখনো-বা পরাজয়ের সংবাদ আনিতেছে— কিন্তু তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, জয়-পরাজয়ে অবিচলিত থাকিয়া অন্য বীরমাতাদিগকে নিজ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রশমিত করিতেন।

কোনো-এক যুদ্ধে জয়লাভ হইলে ওয়াশিংটনের মাতার নিকট তাঁহার বন্ধুগণ আসিয়া সেই সুসংবাদ দিলেন এবং ওয়াশিংটন সম্বন্ধে যে-সকল প্রশংসার কথা ছিল তাঁহারা যুদ্ধের পত্র হইতে পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই সুসংবাদে মাতা খুশি হইলেন, কিন্তু বেশি প্রশংসার কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু মহাশয়গণ, এ বড়ো বেশিরকম স্তুতিবাদ— তবুও আমি জর্জকে ছেলেবেলায় যে শিক্ষা দিয়েছিলেম বোধ হয় সে ভুলবে না— এত প্রশংসা শুনেও বোধ হয় সে আত্মবিস্মৃত হবে না।"

প্রথম হইতে ওয়াশিংটনের মাতা যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন— ইংরেজ সেনাপতি কর্নওআলিস

পরাজিত হইয়াছেন এবং আমেরিকেরা জয়ী হইয়াছে, তখন তিনি করজোড়ে বলিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বরকে প্রণাম। এতদিনে যুদ্ধ শেষ হইল, এক্ষণে আমাদের দেশ সুখ-শান্তি-স্বাধীনতার প্রসাদ উপভোগ করিবে।"

যখন ওয়াশিংটনের নাম জগদ্বিখ্যাত হইল— তাঁহার গৃহে সৌভাগ্যরবি উদয় হইল, তখনো তাঁহার মাতার সাদাসিধা অভ্যাস ও তাঁহার সরল গাম্ভীর্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। সেই তিনি পূর্বেকার ন্যায় গৃহস্থালি কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, ঘোড়ায় চড়িয়া আপনার খেত পরিদর্শন করিতেন ; যদিও তাঁহার টাকাকড়ি বেশি ছিল না তবু মিতব্যয়ী হইয়া পরিশ্রমের সহিত সাংসারিক কাজকর্ম এমন গুছাইয়া করিতেন যে তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র অনটন হইত না, বরং তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হইতে অনেক গরিব কাঙালকে দান করিতেন। ৮২ বৎসর বয়স পর্যন্ত এইরূপ গৃহস্থালি কাজকর্ম করিয়া একটি যৎসামান্য গৃহে নিজ চরিত্রের স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষা করিয়া বরাবর সমানভাবে চলিয়া আসিয়াছেন।

তাঁহার ছেলেরা ও তাঁহার নাতিপুতিরা আসিয়া বৃদ্ধ বয়সের উপযুক্ত কোনো ভালো গৃহে যাইতে সর্বদা তাঁহাকে অনুরোধ করিত। কিন্তু তিনি তাহাদের এই উত্তর করিতেন, "তোমাদের ভালোবাসা ও ভক্তির পরিচয় পেয়ে তোমাদের উপর আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, এই পৃথিবীতে আমার অভাব অতি অল্প, আর আমার নিজের রক্ষণভার আমি নিজেই নিতে পারি।" তাঁহার জামাতা একবার বলিয়াছিলেন যে সাংসারিক কাজকর্ম-নির্বাহের ভার তাঁহার উপর দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হউন। তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে— আমার বইগুলি শুধু আমার হয়ে তুমি গুছিয়ে রেখো, কিন্তু সাংসারিক কাজকর্ম আমিই চালাব।"

ওয়াশিংটনের মাতা অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। জীবনের শেষাবস্থায় তিনি আর প্রকাশ্য উপাসনা-মন্দিরে যাইতেন না—

প্রতিদিন তাঁহার গৃহের নিকটবর্তী পাহাড় কিম্বা গাছপালা-বিশিষ্ট কোনো বিজন স্থানে সংসার হইতে এবং সাংসারিক বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া ভগবানের পূজা-অর্চনা ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন।

সাত বৎসর বিচ্ছেদের পর মাতাপুত্রে পুনর্বার সাক্ষাৎ হইল। যুদ্ধ শেষ হইলে ওয়াশিংটন সৈন্যসামন্ত লইয়া ইয়র্ক টাউন হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ঘোটক-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া মাতার নিকট তাঁহার আগমন-সংবাদ পাঠাইলেন এবং সৈন্যসামন্ত জাঁকজমক পশ্চাতে রাখিয়া তিনি একাকী পদব্রজে তাঁহার মাতৃ-গৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি জানিতেন, জাঁকজমক আড়ম্বরে তাঁহার মাতা আহ্লাদিত হইবেন না।

গৃহকর্ত্রী একাকী সাংসারিক কাজকর্ম করিতেছিলেন এমন সময়ে শুনিলেন, তাঁহার পুত্র দ্বারদেশে উপস্থিত। তিনি তাঁহার ছেলেবেলার নাম ধরিয়া তাঁহাকে সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন— তাঁহার স্বাস্থ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন— বলিলেন যুদ্ধের ভাবনায় তাঁহার মুখে কষ্টের রেখা পড়িয়াছে; সে কালের কথা, পুরাতন বন্ধুদিগের বিষয়, অনেক বলিলেন, কিন্তু পুত্রের নবোপার্জিত যশ-গৌরবের বিষয় একটি কথাও বলিলেন না।

ইতিমধ্যে গ্রামের মধ্যে মহা ধুম পড়িয়া গেল— ফরাসি ও আমেরিক -সৈন্যেরা, সেনানায়কগণ ও পার্শ্ববর্তী স্থানের ভদ্রলোকেরা বিজয়ীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামবাসীগণ নৃত্য-আমোদ-আহ্লাদের একটি প্রকাণ্ড আয়োজন করিল এবং বিশেষ করিয়া ওয়াশিংটনের মাতাকে নিমন্ত্রণ করিল। সকলেই মনে করিতেছিল, য়ুরোপীয় প্রথা অনুসারে ওয়াশিংটনের মাতা নিমন্ত্রণস্থলে খুব সাজসজ্জা ও খুব ধুমধাম করিয়া আসিবেন। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল, তাঁহার পুত্রের বাহুতে ভর দিয়া অতি সামান্য বেশে তাঁহার মাতা অভ্যর্থনা-গৃহে প্রবেশ করিলেন তখন

সকলেই বিস্মিত হইল। তাঁহাকে উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নানা-প্রকার প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না এবং সেখানে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া বলিলেন, "তোমরা আমোদ-আহ্লাদ করো— সুখে থাকো; এই আমার আশীর্বাদ। আমাদের মতো বুড়োমানুষের এখন বাড়ি যাওয়াই উচিত।" এই বলিয়া তিনি সকাল-সকাল বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

ফরাসিস সেনাপতি লফাইএট য়ুরোপে প্রস্থান করিবার সময় ওয়াশিংটনের মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসায় তিনি ফরাসিস সেনাপতিকে আশীর্বাদ করিলেন, এবং তাঁহার মুখে পুত্রের ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "জর্জ যাহা করিয়াছে তাহাতে আমি আশ্চর্য হই নাই, কারণ সে বরাবরই খুব ভালো ছেলে ছিল।"

জর্জ ওয়াশিংটন প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া নিউইয়র্ক নগরে যাইবার পূর্বে তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "মা, আমাকে সকলে এক বাক্যে ইউনাইটেড স্টেটস সাম্রাজ্যের সর্বপ্রধান পদে নিযুক্ত করিয়াছে; আমি সেই কাজে নিযুক্ত হইবার পূর্বেই তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। নূতন শাসন-প্রণালীর বন্দোবস্তকার্য শেষ হইবামাত্রই আমি শীঘ্র বর্জিনিয়াতে আসিব, আর—" তাঁহার মাতা এই সময়ে তাঁহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, "আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। আমার যেরকম বয়স হইয়াছে, আর যে রোগে আমাকে ধরিয়াছে, তাহাতে এ-লোকে আর বেশি দিন আমার থাকিতে হইবে না। ঈশ্বরের আশীর্বাদে বোধ হয় আমি উন্নততর লোকের জন্য কতকটা প্রস্তুত হইয়াছি। কিন্তু তুমি যাও জর্জ, ঈশ্বর তোমার প্রতি যে মহান কাজের ভার দিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করো; যাও— ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও তোমার মায়ের আশীর্বাদ তোমাকে সর্বদাই রক্ষা করিবে।"

ওয়াশিংটনের হৃদয় বিগলিত হইল। মাতার স্কন্ধে তাঁহার মস্তক ন্যস্ত ছিল, বৃদ্ধ মাতা তাঁহার দুর্বল বাহুপাশে পুত্রের কণ্ঠদেশ স্নেহভরে জড়াইয়া ছিলেন। যাঁহার কঠোর কটাক্ষে তেজীয়ান বীরবৃন্দ ভয়ে স্তব্ধ হইয়া থাকিত, সেই নেত্র আজ স্নিগ্ধ ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া বৃদ্ধ মাতার মুখের পানে অবনত দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বীরপুরুষ শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার পূর্ব-কথা স্মরণ হইতে লাগিল—যে মাতার স্নেহ, যত্ন ও শিক্ষার গুণে তিনি যশের সর্বোচ্চ শিখরে অরোহণ করিয়াছেন সেই মাতাকে জন্মের মতো বিদায় দিতে হইবে, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না, এই মনে করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার মাতা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। পুরাতন রোগ প্রবল হইয়া উঠিল; ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন।

বনবাস

বাবা যদি রামের মতো
পাঠায় আমায় বনে,
যেতে আমি পারি নে কি
তুমি ভাবছ মনে।
চোদ্দ বছর ক'দিনে হয়
জানি নে মা ঠিক,
দণ্ডকবন আছে কোথায়
ওই মাঠে কোন্ দিক।
কিন্তু আমি পারি যেতে,
ভয় করি নে তাতে—

লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

বনের মধ্যে গাছের ছায়ায়
বেঁধে নিতেম ঘর;
সামনে দিয়ে বইত নদী
পড়ত বালির চর।
ছোটো একটি থাকত ডিঙি
পারে যেতেম বেয়ে—
হরিণ চ'রে বেড়ায় সেথা,
কাছে আসত ধেয়ে।
গাছের পাতা খাইয়ে দিতেম
আমি নিজের হাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

কত যে গাছ ছেয়ে থাকত
কত রকম ফুলে,
মালা গেঁথে প'রে নিতেম
জড়িয়ে মাথার চুলে।
নানা রঙের ফলগুলি সব
ভুঁয়ে পড়ত পেকে,
ঝুড়ি ভ'রে ভ'রে এনে
ঘরে দিতেম রেখে।
খিদে পেলে দুই ভায়েতে
খেতেম পদ্মপাতে,

লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

রোদের বেলায় অশথ-তলায়
ঘাসের 'পরে আসি
রাখাল ছেলের মতো কেবল
বাজাই ব'সে বাঁশি।
ডালের উপর ময়ুর থাকে,
পেখম পড়ে ঝুলে—
কাঠবেড়ালি ছুটে বেড়ায়
নেজটি পিঠে তুলে।
কখন আমি ঘুমিয়ে যেতাম
দুপুরবেলার তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

সন্ধেবেলায় কুড়িয়ে আনি
শুকোনো ডালপালা।
বনের ধারে ব'সে থাকি
আগুন হলে জ্বালা।
পাখিরা সব বাসায় ফেরে,
দূরে শেয়াল ডাকে,
সন্ধেতারা দেখা যে যায়
ডালের ফাঁকে ফাঁকে।

ছুটির পড়া

মায়ের কথা মনে করি
বসে আঁধার রাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

ঠাকুরদাদার মতো বনে
আছেন ঋষি মুনি,
তাদের পায়ে প্রণাম ক'রে
গল্প অনেক শুনি।
রাক্ষসেরে ভয় করি নে,
আছে গুহক মিতা—
রাবণ আমার কী করবে মা,
নেই তো আমার সীতা।
হনুমানকে যত্ন ক'রে
খাওয়াই দুধে ভাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

মা গো, আমায় দে-না কেন
একটি ছোটো ভাই—
দুই জনেতে মিলে আমরা
বনে চ'লে যাই।
আমাকে মা শিখিয়ে দিবি
রামযাত্রার গান—

মাথায় বেঁধে দিবি চুড়ো,
হাতে ধনুক বাণ।
চিত্রকুটের পাহাড়ে যাই
এম্‌নি বরষাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে।

মুকুট

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজধর পরীক্ষা-দিনের পূর্বে যখন কমলাদেবীর সাহায্যে ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনই ইন্দ্রকুমারের তূণ হইতে ইন্দ্রকুমারের নামাঙ্কিত একটি তীর নিজের তূণে তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজের নামাঙ্কিত একটি তীর ইন্দ্রকুমারের তূণে এমন স্থানে এমন ভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহাতে সেইটিই সহজে ও সর্বাগ্রে তাঁহার হাতে উঠিতে পারে। রাজধর যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। ইন্দ্রকুমার দৈবক্রমে রাজধরের স্থাপিত তীরই তুলিয়া লইয়াছিলেন— সেইজন্যই পরীক্ষাস্থলে এমন গোলমাল হইয়াছিল। কালক্রমে যখন সমস্ত শান্তভাব ধারণ করিল তখন ইন্দ্রকুমার রাজধরের চাতুরী কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না— কিন্তু রাজধরের প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

ইন্দ্রকুমার মহারাজের কাছে বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত যুদ্ধে আমাদিগকে পাঠান।"

মহারাজ অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

আমরা যে সময়ের গল্প বলিতেছি সে আজ প্রায় তিনশো

বৎসরের কথা। তখন ত্রিপুরা স্বাধীন ছিল এবং চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধীন ছিল। আরাকান চট্টগ্রামের সংলগ্ন। আরাকানপতি মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতেন। এইজন্য আরাকানের সঙ্গে ত্রিপুরার মাঝে মাঝে বিবাদ বাধিত। অমরমাণিক্যের সহিত আরাকানপতির সম্প্রতি সেইরূপ একটি বিবাদ বাধিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইন্দ্রকুমার যুদ্ধে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে সম্মতি দিলেন। তিন ভাইয়ে পাঁচ হাজার করিয়া পনেরো হাজার সৈন্য লইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে চলিলেন। ইশা খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া গেলেন।

কর্ণফুলি নদীর পশ্চিম ধারে শিবির-স্থাপন হইল। আরাকানের সৈন্য কতক নদীর ও পারে কতক এ পারে। আরাকানপতি অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে আছেন এবং তাঁহার বাইশ হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আক্রমণের প্রতীক্ষায় নদীর পশ্চিম পারে অপেক্ষা করিয়া আছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র পর্বতময়। সমুখা-সমুখী দুই পাহাড়ের উপর দুই পক্ষের সৈন্য স্থাপিত হইয়াছে। উভয় পক্ষ যদি যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয় তবে মাঝের উপত্যকায় দুই সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। পর্বতের চারি দিকে হরীতকী আমলকী শাল ও গাম্ভারীর বন। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের শূন্য গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছে। মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র। পাহাড়িরা সেখানে ধান কাপাস তরমুজ আলু একত্রে রোপণ করিয়া গিয়াছে। আবার এক-এক জায়গায় জুমিয়া চাষারা এক-একটা পাহাড় সমস্ত দগ্ধ করিয়া কালো করিয়া রাখিয়াছে, বর্ষার পর সেখানে শস্য বপন হইবে। দক্ষিণে কর্ণফুলি, বামে দুর্গম পর্বত।

এইখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল উভয় পক্ষ পরস্পরের আক্রমণ-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের জন্য অস্থির হইয়াছেন, কিন্তু যুবরাজের ইচ্ছা বিপক্ষ-পক্ষেরা আগে আসিয়া আক্রমণ করে।

সেইজন্য বিলম্ব করিতেছেন— কিন্তু তাহারাও নড়িতে চাহে না, স্থির হইয়া আছে। অবশেষে আক্রমণ করাই স্থির হইল।

সমস্ত রাত্রি আক্রমণের আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজধর প্রস্তাব করিলেন, "দাদা, তোমরা দুইজনে তোমাদের দশ হাজার সৈন্য লইয়া আক্রমণ করো। আমার পাঁচ হাজার হাতে থাক্, আবশ্যকের সময় কাজে লাগিবে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "রাজধর তফাতে থাকিতে চান।"

যুবরাজ কহিলেন, "না, হাসির কথা নয়। রাজধরের প্রস্তাব আমার ভালো বোধ হইতেছে।" ইশা খাঁও তাহাই বলিলেন। রাজধরের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমারের অধীনে দশ হাজার সৈন্য পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইল। প্রত্যেক ভাগে দুই হাজার করিয়া সৈন্য রহিল। স্থির হইল, একেবারে শত্রুব্যূহের পাঁচ জায়গায় আক্রমণ করিয়া ব্যূহভেদ করিবার চেষ্টা করা হইবে। সর্বপ্রথম সারে ধানুকীরা রহিল, তার পরে তলোয়ার বর্শা প্রভৃতি লইয়া অন্য পদাতিকেরা রহিল এবং সর্বশেষে অশ্বারোহীরা সার বাঁধিয়া চলিল।

আরাকানের মগ-সৈন্যেরা দীর্ঘ এক বাঁশবনের পশ্চাতে ব্যূহ রচনা করিয়াছিল। প্রথম দিনের আক্রমণে কিছুই হইল না। ত্রিপুরার সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় দিন সমস্তদিন নিষ্ফল যুদ্ধ-অবসানে রাত্রি যখন নিশীথ হইল, যখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা বিশ্রামলাভ করিতেছে, দুই পাহাড়ের উপর দুই শিবিরে স্থানে স্থানে কেবল এক-একটা আগুন জ্বলিতেছে, শৃগালেরা রণক্ষেত্রে ছিন্ন হস্ত পদ ও মৃতদেহের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দলে দলে কাঁদিয়া উঠিতেছে— তখন শিবিরের দুই ক্রোশ দূরে রাজধর তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া সারবন্দী নৌকা বাঁধিয়া

কর্ণফুলি নদীর উপরে নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়াছেন। একটি মশাল নাই, শব্দ নাই, সেতুর উপর দিয়া অতি সাবধানে সৈন্য পার করিতেছেন। নীচে দিয়া যেমন অন্ধকারে নদীর স্রোত বহিয়া যাইতেছে তেমনি উপর দিয়া মানুষের স্রোত অবিচ্ছিন্ন বহিয়া যাইতেছে। নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে। পরপারের পর্বতময় দুর্গম পাড় দিয়া সৈন্যেরা অতি কষ্টে উঠিতেছে। রাজধরের প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষ ইশা খাঁর আদেশ ছিল যে, রাজধর রাত্রিযোগে তাঁহার সৈন্যদের লইয়া নদী বাহিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিবেন— তীরে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে লুক্কায়িত থাকিবেন। প্রভাতে যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার সম্মুখ ভাগে আক্রমণ করিবেন— বিপক্ষেরা যুদ্ধে শ্রান্ত হইলে পর সংকেত পাইলে রাজধর সহসা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবেন। সেইজন্যই এত নৌকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজধর ইশা খাঁর আদেশ কই পালন করিলেন? তিনি তো সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি আর-এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিনি নিঃশব্দে আরাকানের রাজার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। চতুর্দিকে পর্বত, মাঝে উপত্যকা, রাজার শিবির তাহারই মাঝখানে অবস্থিত। শিবিরে নির্ভয়ে সকলে নিদ্রিত। মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখিয়া দূর হইতে শিবিরের স্থান-নির্ণয় হইতেছে। পর্বতের উপর হইতে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া রাজধরের পাঁচ হাজার সৈন্য অতি সাবধানে উপত্যকার দিকে নামিতে লাগিল— বর্ষাকালে যেমন পর্বতের সর্বাঙ্গ দিয়া গাছের শিকড় ধুইয়া ঘোলা হইয়া জলধারা নামিতে থাকে— তেমনি পাঁচ সহস্র মানুষ, পাঁচ সহস্র তলোয়ার, অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাছের নীচে দিয়া সহস্র পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছু শব্দ নাই, মন্দ গতি। সহসা পাঁচ সহস্র সৈন্যের ভীষণ চীৎকার উঠিল— ক্ষুদ্র শিবির যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং তাহার ভিতর হইতে মানুষগুলা কিলবিল করিয়া বাহির

হইয়া পড়িল। কেহ মনে করিল দুঃস্বপ্ন, কেহ মনে করিল প্রেতের উৎপাত, কেহ কিছুই মনে করিতে পারিল না।

রাজা বিনা রক্তপাতে বন্দী হইলেন। রাজা বলিলেন, "আমাকে বন্দী করিলে বা বধ করিলে যুদ্ধের অবসান হইবে না। আমি বন্দী হইবামাত্র সৈন্যেরা আমার ভাই হামচুপামুকে রাজা করিবে। যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে। আমি বরঞ্চ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।"

রাজধর তাহাতেই সম্মত হইলেন। আরাকানরাজ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিলেন। একটি হস্তিদন্তনির্মিত মুকুট, পাঁচ শত মণিপুরি ঘোড়া ও তিনটে বড়ো হাতি উপহার দিলেন। এইরূপ নানা ব্যবস্থা করিতে করিতে প্রভাত হইল— বেলা হইয়া গেল। সুদীর্ঘ রাত্রে সমস্তই ভূতের ব্যাপার বলিয়া মনে হইয়াছিল, দিনের বেলা আরাকানের সৈন্যগণ আপনাদের অপমান স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল। চারি দিকে বড়ো বড়ো পাহাড় সূর্যালোকে সহস্রচক্ষু হইয়া তাহাদিগের দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজধর আরাকানপতিকে কহিলেন, "আর বিলম্ব নয়, শীঘ্র যুদ্ধ নিবারণ করিবার এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিন। ও পারে এতক্ষণে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেছে।"

কতকগুলি সৈন্যসহিত দূতের হস্তে আদেশপত্র পাঠানো হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অতি প্রত্যুষেই অন্ধকার দূর হইতে না-হইতেই, যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার দুই ভাগে পশ্চিমে ও পূর্বে মগদিগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। সৈন্যের অল্পতা লইয়া রূপনারায়ণ হাজারি দুঃখ করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন— আর পাঁচ হাজার লইয়া আসিলেই আর ভাবনা ছিল না। ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "ত্রিপুরারির অনুগ্রহ যদি হয় তবে এই কয়জন সৈন্য লইয়াই জিতিব, আর যদি না হয় তবে বিপদ

আমাদের উপর দিয়াই যাক, ত্রিপুরাবাসী যত কম মরে ততই ভালো। কিন্তু হরের কৃপায় আজ আমরা জিতিবই।” এই বলিয়া হর হর বোম্ বোম্ রব তুলিয়া কৃপাণ বর্শা লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বিপক্ষদের অভিমুখে ছুটিলেন — তাঁহার দীপ্ত উৎসাহ তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গ্রীষ্মকালে দক্ষিনা বাতাসে খড়ের চালের উপর গিয়া আগুন যেমন ছোটে তাঁহার সৈন্যেরা তেমনি ছুটিতে লাগিল। কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। বিপক্ষদের দক্ষিণ দিকের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। মানুষের মাথা ও দেহ কাটা শস্যের মতো শস্যক্ষেত্রের উপর গিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্রকুমারের ঘোড়া কাটা পড়িল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রব উঠিল তিনি মারা পড়িয়াছেন। কুঠারাঘাতে এক মগ অশ্বারোহীকে অশ্বচ্যুত করিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ তাহার ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিলেন। রেকাবের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার রক্তাক্ত তলোয়ার আকাশে সূর্যালোকে উঠাইয়া বজ্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “হর হর বোম্ বোম্!” যুদ্ধের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া মগদিগের বাম দিকের ব্যূহের সৈন্যগণ আক্রমণের প্রতীক্ষা না করিয়া সহসা বাহির হইয়া যুবরাজের সৈন্যের উপর গিয়া পড়িল। যুবরাজের সৈন্যেরা সহসা এরূপ আক্রমণ প্রত্যাশা করে নাই। তাহারা মুহূর্তের মধ্যে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহাদের নিজের অশ্ব নিজের পদাতিকের উপর গিয়া পড়িল, কোন্ দিকে যাইবে ঠিকানা পাইল না। যুবরাজ ও ইশা খাঁ অসম সাহসের সহিত সৈন্যদের সংযত করিয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অদূরে রাজধরের সৈন্য লুক্কায়িত আছে কল্পনা করিয়া সংকেতস্বরূপ বার বার তূরী-নিনাদ করিলেন, কিন্তু রাজধরের সৈন্যদের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ইশা খাঁ বলিলেন, “তাঁহাকে ডাকা বৃথা। সে শৃগাল, দিনের বেলা গর্ত হইতে বাহির

হইবে না।” ইশা খাঁ ঘোড়া হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িলেন। পশ্চিম-মুখ হইয়া সত্বর নামাজ পড়িয়া লইলেন। মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ‘মরিয়া’ হইয়া লড়িতে লাগিলেন। চারি দিকে মৃত্যু যতই ঘেরিতে লাগিল, দুর্দান্ত যৌবন ততই যেন তাঁহার দেহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় ইন্দ্রকুমার শত্রুদের এক অংশ সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যুবরাজের একদল অশ্বারোহী সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পালাইতেছে, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইলেন। বিদ্যুদ্‌বেগে যুবরাজের সাহায্যার্থে আসিলেন কিন্তু সে বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই কুল-কিনারা পাইলেন না। ঘূর্ণা বাতাসে মরুভূমির বালুকারাশি যেমন ঘুরিতে থাকে উপত্যকার মাঝখানে যুদ্ধ তেমনই পাক খাইতে লাগিল। রাজধরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বার বার তূরীধ্বনি উঠিল, কিন্তু তাহার উত্তর পাওয়া গেল না।

সহসা কী মন্ত্রবলে সমস্ত থামিয়া গেল, যে যেখানে ছিল স্থির হইয়া দাঁড়াইল— আহতের আর্তনাদ ও অশ্বের হ্রেষা ছাড়া আর শব্দ রহিল না। সন্ধির নিশান লইয়া লোক আসিয়াছে। মগদের রাজা পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। হর হর বোম্ বোম্ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। মগসৈন্যগণ আশ্চর্য হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রাজধর যখন জয়োপহার লইয়া আসিলেন তখন তাঁহার মুখে এত হাসি যে, তাঁহার ছোটো চোখ দুটা বিন্দুর মতো হইয়া পিট্‌পিট্ করিতে লাগিল। হাতির দাঁতের মুকুট বাহির করিয়া ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন, “এই দেখো, যুদ্ধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পুরস্কার পাইয়াছি।”

ইন্দ্রকুমার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যুদ্ধ! যুদ্ধ তুমি কোথায় করিলে! এ পুরস্কার তোমার নহে। এ মুকুট যুবরাজ পরিবেন।"

রাজধর কহিলেন, "আমি জয় করিয়া আনিয়াছি ; এ মুকুট আমি পরিব।"

যুবরাজ কহিলেন, "রাজধর ঠিক কথা বলিতেছেন, এ মুকুট রাজধরেরই প্রাপ্য।"

ইশা খাঁ চটিয়া রাজধরকে বলিলেন, "তুমি মুকুট পরিয়া দেশে যাইবে! তুমি সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ হইতে পালাইলে, এ কলঙ্ক একটা মুকুটে ঢাকা পড়িবে না। তুমি একটা ভাঙা হাঁড়ির কানা পরিয়া দেশে যাও, তোমাকে সাজিবে ভালো।"

রাজধর বলিলেন, "খাঁ-সাহেব, এখন তো তোমার মুখে খুব বোল ফুটিতেছে— কিন্তু আমি না থাকিলে তোমরা এতক্ষণে থাকিতে কোথায়?"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "যেখানেই থাকি, যুদ্ধ ছাড়িয়া গর্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতাম না।"

যুবরাজ বলিলেন, "ইন্দ্রকুমার, তুমি অন্যায় বলিতেছ। সত্য কথা বলিতে কি, রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের বিপদ হইত।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের কোনো বিপদ হইত না। রাজধর না থাকিলে এই মুকুট আমি যুদ্ধ করিয়া আনিতাম— রাজধর চুরি করিয়া আনিয়াছে। দাদা, এ মুকুট আনিয়া আমি তোমাকে পরাইয়া দিতাম, নিজে পরিতাম না।"

যুবরাজ মুকুট হাতে লইয়া রাজধরকে বলিলেন, "ভাই, তুমিই আজ জিতিয়াছ। তুমি না থাকিলে অল্প সৈন্য লইয়া আমাদের কী বিপদ হইত জানি না। এ মুকুট আমি তোমাকে পরাইয়া দিতেছি।" বলিয়া রাজধরের মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমারের বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল— তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "দাদা, রাজধর শৃগালের মতো গোপনে রাত্রিযোগে চুরি

করিয়া এই রাজমুকুট পুরস্কার পাইল ; আর আমি যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলাম— তোমার মুখ হইতে একটা প্রশংসার বাক্যও শুনিতে পাইলাম না। তুমি কিনা বলিলে, রাজধর না থাকিলে কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না। কেন দাদা, আমি কি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার চোখের সামনে যুদ্ধ করি নাই— আমি কি যুদ্ধ ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলাম— আমি কি কখনো ভীরুতা দেখাইয়াছি। আমি কি শত্রুসৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তোমার সাহায্যের জন্য আসি নাই। কী দেখিয়া তুমি বলিলে যে, তোমার পরম স্নেহের রাজধর ব্যতীত কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না।"

যুবরাজ একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলিতেছি না—"

কথা শেষ হইতে না-হইতে অভিমানে ইন্দ্রকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাহাকেও দিবার অধিকার নাই। আমি সেনাপতি, এ মুকুট আমি যাহাকে দিব তাহারই হইবে।" বলিয়া ইশা খাঁ রাজধরের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া যুবরাজের মাথায় দিতে গেলেন।

যুবরাজ সরিয়া গিয়া বলিলেন, "না, এ আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

ইশা খাঁ বলিলেন, "তবে থাক্। এ মুকুট কেহ পাইবে না।" বলিয়া পদাঘাতে মুকুট কর্ণফুলি নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, "রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন— রাজধর শাস্তির যোগ্য।"

দশম পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া আহত হৃদয়ে শিবির হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। যুদ্ধ অবসান হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার সৈন্য

শিবির তুলিয়া দেশে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় সহসা এক ব্যাঘাত ঘটিল।

ইশা খাঁ যখন মুকুট কাড়িয়া লইলেন রাজধর মনে মনে কহিলেন, 'আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করিয়া উদ্ধার পাও একবার দেখিব।'

তাহার পরদিন রাজধর গোপনে আরাকানপতির শিবিরে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। সেই পত্রে তিনি ত্রিপুরার সৈন্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের সংবাদ দিয়া আরাকানপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

ইন্দ্রকুমার যখন স্বতন্ত্র হইয়া সৈন্যসমেত স্বদেশাভিমুখে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং যুবরাজের সৈন্যরা শিবির তুলিয়া গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, তখন সহসা মগেরা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল— রাজধর সৈন্য লইয়া কোথায় সরিয়া পড়িলেন তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

যুবরাজের হতাবশিষ্ট তিন সহস্র সৈন্য প্রায় তাহার চতুর্গুণ মগসৈন্য-কর্তৃক হঠাৎ বেষ্টিত হইল। ইশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "আজ আর পরিত্রাণ নাই। যুদ্ধের ভার আমার উপর দিয়া তুমি পলায়ন করো।"

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "পালাইলেও তো একদিন মরিতে হইবে।" চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন— "পালাইব বা কোথা। এখানে মরিবার যেমন সুবিধা পালাইবার তেমন সুবিধা নাই। হে ঈশ্বর, সকলই তোমার ইচ্ছা।"

ইশা খাঁ বলিলেন, "তবে আইস, আজ সমারোহ করিয়া মরা যাক।" বলিয়া প্রাচীরবৎ শত্রুসৈন্যের এক দুর্বল অংশ লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সৈন্য বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটাইয়া দিলেন। পালাইবার পথ রুদ্ধ দেখিয়া সৈন্যেরা উন্মত্তের ন্যায় লড়িতে লাগিল। ইশা খাঁ দুই হাতে দুই তলোয়ার লইলেন— তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একটি লোক তিষ্ঠিতে

পারিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র উৎস উঠিতেছিল, তাহার জল রক্তে লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ শত্রুর ব্যূহ ভাঙিয়া ফেলিয়া লড়িতে লড়িতে প্রায় পর্বতের শিখর পর্যন্ত উঠিয়াছেন, এমন সময় এক তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি আল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন।

যুবরাজের জানুতে এক তীর, পৃষ্ঠে এক তীর এবং তাঁহার বাহন হাতির পঞ্জরে এক তীর বিদ্ধ হইল। মাহুত হত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। হাতি যুদ্ধক্ষেত্র ফেলিয়া উন্মাদের মতো ছুটিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাকে ফিরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, সে ফিরিল না। অবশেষে তিনি যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে দুর্বল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে কর্ণফুলি নদীর তীরে হাতির পিঠ হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আজ রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে। অন্য দিন রাত্রে যে সবুজ মাঠের উপরে চাঁদের আলো বিচিত্রবর্ণ ছোটো ছোটো বনফুলের উপর আসিয়া পড়িত, আজ সেখানে সহস্র সহস্র মানুষের হাত, পা, কাটা মুণ্ড ও মৃতদেহের উপর আসিয়া পড়িয়াছে— যে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ উৎসের জলে সমস্ত রাত ধরিয়া চন্দ্রের প্রতিবিম্ব নৃত্য করিত, সে উৎস মৃত অশ্বের দেহে প্রায় রুদ্ধ— তাহার জল রক্তে লাল হইয়া গেছে। কিন্তু দিনের বেলা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যেখানে মৃত্যুর ভীষণ উৎসব হইতেছিল, ভয় ক্রোধ নিরাশা হিংসা সহস্র হৃদয় হইতে অনবরত ফেনাইয়া উঠিতেছিল— অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্‌, উন্মাদের চীৎকার, আহতের আর্তনাদ, অশ্বের হ্রেষা, রণশঙ্খের ধ্বনিতে নীল আকাশ যেন মথিত হইতেছিল —রাত্রে চাঁদের আলোতে সেখানে কী অগাধ শান্তি, কী সুগভীর

বিষাদ। মৃত্যুর নৃত্য যেন ফুরাইয়া গেছে, কেবল প্রকাণ্ড নাট্যশালার চারি দিকে উৎসবের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। সাড়াশব্দ নাই, প্রাণ নাই, চেতনা নাই, হৃদয়ের তরঙ্গ স্তব্ধ। এক দিকে পর্বতের সুদীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে, এক দিকে চাঁদের আলো। মাঝে মাঝে পাঁচ-ছয়টা করিয়া বড়ো বড়ো গাছ ঝাঁকড়া মাথা লইয়া শাখা-প্রশাখা জটাজুট আঁধার করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ পাইয়া যখন যুবরাজকে খুঁজিতে আসিতেছেন, তখন যুবরাজ কর্ণফুলি নদীর তীরে ঘাসের শয্যার উপর শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে অঞ্জলি পূরিয়া জলপান করিতেছেন, মাঝে মাঝে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া চোখ বুজিয়া আসিতেছে। দূরে সমুদ্রের দিক হইতে বাতাস আসিতেছে। কানের কাছে কুল্‌কুল্‌ করিয়া নদীর জল বহিয়া যাইতেছে। জনপ্রাণী নাই। চারি দিকে বিজন পর্বত দাঁড়াইয়া আছে— বিজন অরণ্য ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে— আকাশে চন্দ্র একাকী। জ্যোৎস্নালোকে অনন্ত নীলাকাশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রকুমার যখন বিদীর্ণ হৃদয়ে "দাদা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তখন আকাশ পাতাল যেন শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রনারায়ণ চমকিয়া জাগিয়া "এসো ভাই" বলিয়া আলিঙ্গনের জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন। ইন্দ্রকুমার দাদার আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ হইয়া শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আঃ, বাঁচিলাম ভাই। তুমি আসিবে জানিয়াই এতক্ষণ কোনোমতে আমার প্রাণ বাহির হইতেছিল না। ইন্দ্রকুমার, তুমি আমার উপরে অভিমান করিয়াছিলে, তোমার সেই অভিমান লইয়া কি আমি মরিতে পারি। আজ আবার দেখা হইল, তোমার প্রেম আবার ফিরিয়া পাইলাম— এখন মরিতে আর কোনো কষ্ট নাই।" বলিয়া দুই হাতে তাঁহার তীর উৎপাটন করিলেন। রক্ত ছুটিয়া পড়িল, তাঁহার শরীর হিম হইয়া আসিল—

মৃত্যুস্বরে বলিলেন, "মরিলাম তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু আমাদের পরাজয় হইল।"

ইন্দ্রকুমার কাঁদিয়া কহিলেন, "পরাজয় তোমার হয় নাই দাদা, পরাজয় আমারই হইয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "দয়াময়, ভবের খেলা শেষ করিয়া আসিলাম, এখন তোমার কোলে স্থান দাও।" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ভোরের বেলা নদীর পশ্চিম পাড়ে চন্দ্র যখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল, চন্দ্রনারায়ণের মুদ্রিতনেত্র মুখচ্ছবিও তখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবন অস্তমিত হইল।

পরিশিষ্ট

বিজয়ী মগ-সৈন্যেরা সমস্ত চট্টগ্রাম ত্রিপুরার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর পর্যন্ত লুণ্ঠন করিল। অমরমাণিক্য দেওঘাটে পালাইয়া গিয়া অপমানে আত্মহত্যা করিয়া মরিলেন। ইন্দ্রকুমার মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়াই মরেন— জীবন ও কলঙ্ক লইয়া দেশে ফিরিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

রাজধর রাজা হইয়া কেবল তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন— তিনি গোমতীর জলে ডুবিয়া মরেন।

ইন্দ্রকুমার যখন যুদ্ধে যান তখন তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহারই পুত্র কল্যাণমাণিক্য রাজধরের মৃত্যুর পরে রাজা হন। তিনি পিতার ন্যায় বীর ছিলেন। যখন সম্রাট শাজাহানের সৈন্য ত্রিপুরা আক্রমণ করে, তখন কল্যাণমাণিক্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

সূর্যকিরণের ঢেউ

সূর্যকিরণ জিনিসটা কী জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা বলিবে— সূর্যকিরণ সূর্যের কিরণ, সূর্যের আলো— আবার কী। সূর্যের কিরণ সম্বন্ধে আরো অনেক কথা জানিবার আছে। সূর্যের কিরণ সূর্য হইতে আসিয়া পৃথিবী স্পর্শ করে এইজন্যই বোধ করি তাহাকে সূর্যের কর অর্থাৎ সূর্যের হাত বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সূর্যকিরণকে ঠিক সূর্যের হাত বলা যায় না। কেন যায় না নীচে লিখিতেছি।

মনে করো একটা পুকুরের দুই পারে দুই ঘাট আছে। এক ঘাটে তুমি স্নান করিতেছ, এক ঘাটে আমি স্নান করিতেছি। দূর হইতে তোমাকে আঘাত করিতে হইলে হয় তোমাকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতে হয়, নয় জলে এমন এক ঝাঁকানি দিতে হয় যে এ পার হইতে জলের ঢেউ গিয়া ও পারে তোমার গায়ে লাগে। তোমার সঙ্গে আমি যখন কথা কই তখন কী প্রকারে সেই শব্দ তোমার কানে যায়। তখন তো আমার মুখ হইতে কোনো দ্রব্য তোমার কানে ছোঁড়া হয় না। তখন আমার মুখের কাছে বাতাস নাড়া পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠে— এইরূপে বাতাসে ঢেউ উঠিয়া একটার পর আর-একটা করিয়া শেষে তোমার কানে যে ঢাকের মতো চর্ম আছে তাহাতে আঘাত করে। দূরের দ্রব্যে আঘাত করিবার এই দুই প্রকার উপায় আমরা জানি। প্রথমত কোনো জিনিস ছুঁড়িয়া এবং আঘাত করিয়া; দ্বিতীয়ত দ্রব্যের প্রতি ঢেউ প্রদান করিয়া— জল ও বাতাসের ঢেউ তাহার উদাহরণ।

পণ্ডিত নিউটনের বিশ্বাস ছিল যে সূর্যকিরণ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা নির্মিত, সূর্য সেই কিরণগুলি আমাদের চোখের উপর ছুঁড়িয়া আমাদের চোখে অনবরত আঘাত করিতেছে। কণাগুলির আঘাতে আমরা আলো দেখিতে পাই। অনেক দিন পর্যন্ত লোকেরা নিউটনের এই মত সত্য বলিয়া মনে করিত। পরে অবিশ্বাস করে।

পণ্ডিতেরা বলেন, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-তারা এবং আমাদের পৃথিবী, ইহাদের মধ্যকার আকাশে এমন কোনো বস্তু আছেই যাহা বাতাস ও জল অপেক্ষা ঢের সূক্ষ্ম। এত সূক্ষ্ম যে কাঁচ, কাঠ, ইঁট প্রভৃতির ন্যায় দৃঢ় বস্তুর মধ্য দিয়া ইহার গমনাগমন আছে। ইহাকেও আমরা দেখিতে পাই না। ইহাকে আমরা 'ঈথর' বলি। এই ঈথর সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া আছে। যে পর্যন্ত না তোমরা নিজে ঈথর সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে সমর্থ হইবে সে পর্যন্ত তোমরা পণ্ডিতদের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া এইটি মানিয়া লও যে, অবশ্য ঈথর সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া আছে, এবং সমস্ত বস্তুর মধ্য দিয়া ইহার গমনাগমন আছে। সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ-তারা এই ঈথরের মধ্যে ভাসিতেছে। অতএব সূর্যে বা গ্রহ-তারায় একটা যদি আন্দোলন উপস্থিত হয় তবে এই ঈথরে অবশ্যই তাহার ঘা লাগে। জলে যদি মাছ ধড়্‌ফড়্‌ করে তবে তাহার চতুর্দিকে জল নড়িতে থাকে। সূর্যের চতুর্দিকে নানা প্রকার গ্যাস অর্থাৎ বায়ুর পদার্থ তুমুল মাতামাতি করিতেছে। এই গ্যাসের মধ্যকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি খুব জোরে স্পন্দিত হইয়া ও পরস্পরকে ক্রমাগত আঘাত করিয়া যখন সূর্যে এত আলো ও উত্তাপ সৃষ্টি করিতেছে, তখন কি তোমাদের মনে হয় না যে, পুকুরের জলের ঢেউয়ের মতো সূর্যের নিকটস্থ ঈথর কাঁপিয়া আমাদের নিকট তরঙ্গ প্রেরণ করিতেছে। সূর্যের চতুর্দিক হইতে অবিশ্রাম একটির পর আর-একটি করিয়া ক্ষুদ্র ঢেউ-সকল এই প্রকার ঈথর অবলম্বন করিয়া আমাদের পৃথিবীতে আইসে। পৃথিবীর মধ্যস্থ ভারতবর্ষের অংশটুকু যখন সূর্যের সম্মুখে আসে, তখন সেই ঢেউগুলি ভারতবর্ষের জল-স্থলকে আঘাত করিয়া উত্তপ্ত করে, এবং আমাদের চক্ষুর স্নায়ু-সকলকে আঘাত করে বলিয়া আমরা আলোক দেখিতে পাই। সূর্যের সহস্র সহস্র ঢেউ আমাদের চক্ষুতে প্রতি পলকে অনবরত আঘাত করিলে আমরা যে সমস্ত দিন অবিশ্রাম আলোক দেখিতে পাইব ইহাতে আর আশ্চর্য কী। সূর্য যখন অস্ত যায় তখন আমরা নক্ষত্রদিগের কাছ

হইতে কতকটা আলোক পাইয়া থাকি। তাহারা সূর্যের চেয়ে আরো অধিক দূরে আছে বলিয়া তাহাদের কাছ হইতে আমরা এত অল্প আলো পাই। সূর্য অস্ত না গেলে তাহাদের আমরা দেখিতে পাই না। আশ্চর্য এই যে, ঈথরের ঢেউ আমরা ঠিক দেখি নাই বটে, কিন্তু তাহাদের আমরা মাপিয়াছি, তাহারা কত বড়ো তাহা জানি। এক ইঞ্চি জায়গায় কতগুলি ঢেউ প্রবেশ করিতে পারে তাহাও আমরা জানিয়াছি। কী করিয়া মাপা হইয়াছে তাহা বুঝাইতে গেলে বিস্তর গোল বাধিবে। না বুঝিবারই বেশি সম্ভাবনা। এইটুকু জানিয়া রাখো যে, ঈথরের কোনো কোনো ঢেউ এত ক্ষুদ্র যে এক ইঞ্চি জায়গায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার ঢেউ ধরিতে পারে।

এখন দেখা যাউক কিরূপ বেগে এই ঢেউগুলি চলিয়া থাকে। দ্রুতগামী রেলগাড়িতে চড়িলে ১৭১ বৎসরে সূর্যের নিকট যাওয়া যায়, কিন্তু সূর্যের এ সূক্ষ্ম ঢেউগুলি চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আট মিনিটে পৃথিবীতে আইসে। যে-সকল ঢেউ তোমাদের চক্ষুকে এই মুহূর্তে আঘাত করিতেছে তাহারা কেবল আট মিনিট হইল সূর্যকে ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইহারা বিশ্রাম না করিয়া একটির পর একটি করিয়া সমস্ত দিন তোমাদের চোখের উপর পড়িতেছে।

সহিসের ছেলে

একশো বৎসরের অধিক হইল জর্মনির এক ছোটো প্রদেশের চার্লস নামে এক রাজা আহার করিয়া উঠিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, তাঁহার রাজবাটীর সম্মুখে অনেক লোক জমা হইয়াছে। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, একদল ছেলে। কী, ব্যাপারটা কী। রাজার নিকট একটি নিবেদন আছে। রাজার

সহিসের ছেলে, তাহার নাম ডানেকর। তাহার পায়ে জুতা নাই, গায়ে ময়লা কাপড়, সে অগ্রসর হইয়া আপনাদের প্রার্থনা রাজাকে জানাইল। রাজার একটি স্কুল আছে, কেবল তাঁহার সৈন্যেরা সেই স্কুলে পড়ে। সম্প্রতি শুনা গিয়াছে রাজা নিয়ম করিয়াছেন, অন্য ছেলেরাও সেখানে পড়িতে পাইবে। তাই শুনিয়া রাজার সেই স্কুলে ভর্তি হইবার জন্য ইহারা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে।

সহিসের ছেলে ডানেকর ছবি আঁকিতে বড়ো ভালোবাসিত। সে মাটিতে দেওয়ালে যেখানে পাইত খড়ি দিয়া নানারকম ছবি আঁকিত। সে জানিত রাজার স্কুলে ছবি-আঁকা শিখানো হয়। তাই যখন সে শুনিল রাজার স্কুলে সকলেই যাইতে পারে, তখন ভারি খুশি হইয়া সেই স্কুলে ভর্তি হইবার জন্য বাপের কাছে প্রস্তাব করিল। বাপ চটিয়া গরম হইয়া উঠিয়া কহিল, "তুমি নিজের কাজে মন দাও তো বাপু! লেখাপড়া শিখিতে হইবে না।" এই বলিয়া তাহাকে মারিয়া ঘরে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিল।

ডানেকর জানালার মধ্য দিয়া গলিয়া আপনার সমবয়সী একদল ছোটো ছেলে জুটাইয়া স্বয়ং রাজার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ডানেকরকে স্কুলে পাঠাইতে রাজি হইলেন। ডানেকরের বাপ দেখিল ছেলে স্কুলে গেলে আস্তাবলের কাজের কিছু অসুবিধা হইবে— ভারি বিরক্ত হইয়া মারধোর করিয়া ছেলেকে বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিল। কিন্তু ছেলের মা গুটিকতক গায়ের কাপড় পুঁটুলিতে বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে দিলেন এবং খানিক রাস্তা তাহার সঙ্গে গিয়া ছেলের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলেন ও চোখের জল মুছিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

ডানেকর গরিব। এইজন্য স্কুলে তাহাকে কেহ গ্রাহ্য করিত না। সেখানে তাহাকে উঠান ঝাঁট দিতে হইত; চাকরের কাজ করিতে হইত। বোধ করি যত্ন করিয়া কেহ তাহাকে শিখাইতে চাহিত না। অনেক সময় ডানেকরকে গোপনে লুকাইয়া শিখিতে হইত। স্কুলে

ছবি-আঁকা শেখা ফুরাইলে পর আরো বেশি করিয়া শিখিবার জন্য ডানেকর পায়ে হাঁটিয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন। এমনি করিয়া কুড়ি-পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গেল।

এখন এই ডানেকরের নাম য়ুরোপে সকল জায়গায় বিখ্যাত। ডানেকরের মতো পাথরের মূর্তি গড়িতে কয়জন লোক পারে। যে রাজার স্কুলে তিনি পড়িবার অনুমতি পাইয়াছিলেন তাঁহার নাম আজ বড়ো কাহারো মনেও পড়ে না কিন্তু সেই রাজার একজন সহিসের ছেলের নাম য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্র হইতেছে।

পাঠশালা

হরিশপুরের বোসেদের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসিয়াছে। সকালবেলা, এখনো সূর্য উঠে নাই। পাততাড়ি-কাঁখে ছেলের দল প্রভাতের মৃদু শীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে ক্রমে আসিয়া জুটিতেছে। বাঁ হাতে দোয়াত ঝুলিতেছে আর ডাইন হাতের তো অবসরই নাই। তিনি চালাকদাস ঘটকচূড়ামণির মতো দণ্ডে দণ্ডে মুড়ি-মুড়কি-ভরা কোঁচড় আর আহ্লাদ-ভরা মুখের মধ্যে আনাগোনা করিতেছিলেন। দুই-একটা কাক ফলারে-বামুনের মতো প্রভাতের কোলাহল-কচকচি ছাড়িয়া ছেলেদের সঙ্গ লইল। পল্লীগ্রামের মানুষ তেমন সেয়ানা নয়। কিন্তু সে গুণের জন্য পাড়াগাঁয়ে কাকদের সুখ্যাতি কেহ করে না। শহুরে মানুষগুলোর মধ্যেও তেমন প্রাক্‌টিক্যাল জীব তো কাউকে দেখি নে। প্রমাণ হাতে হাতে। মাথার উপর কা কা শব্দ শুনিয়া যাই ঊর্ধ্বে ছেলেরা চাহিতেছে, অমনি কোঁচড়ের জলপান কিছু কিছু করিয়া পড়িয়া যাইতেছে। অতএব, কাক মহাশয়ের কলকৌশল নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই।

গুরুমহাশয় রামধন ভট্টাচার্য একটা ছেঁড়া বড়ো মাদুর পাতিয়া

চণ্ডীমণ্ডপের এক ধারে বেত হাতে বসিয়া আছেন। ছেলেরা আসিতেছে, আর প্রথমে গুরুমহাশয়ের কাছে হাতছড়ি খাইয়া পাততাড়ির ঢাকা খুলিয়া ছোটো ছোটো মাদুরগুলি সারি সারি বিছাইয়া বসিতেছে— কেহ-বা বেহাত হইয়া মুড়ি-মুড়কি ছড়াইয়া ফেলিতেছে। গুরুমহাশয়ের চেহারাখানা বড়ো জমকালো। আজকাল ভালো মানুষের চেহারার কথা লিখিতে হইলে গৌরবর্ণ না বলিলে লোকের ভালো লাগে না— কিন্তু গরিব গুরুমহাশয়ের তামাটে রঙ, আর মাথায় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী টাক— চুলের সম্পর্কমাত্র নাই। তা ভালো না লাগিলে কী করিব; দেহের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন— তাঁর মার্জিত পইতা-গাছটি। ছেলেরা কানাকানি করে, রোজ গুরু-মহাশয় একটা বেলের আঠা উহাতে লাগাইয়া থাকেন।

গুরুমহাশয়ের চেহারায় ছেলেদের প্রধান লক্ষ্য তাঁহার চোখ-দুটি— গোল গোল লাল চক্ষু। লোকে বলিত, তিনি নাকি গঞ্জিকা সেবন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, বেত হাতে গুরুমহাশয় সেই জবাচক্ষু যার উপর স্থাপিত করেন, কিছুতে তার নিস্তার নাই। বোসদের কুমুদ, বয়স তার সবে পাঁচ বছর, সে বড়ো খুশি হইয়া হাতছড়ি লইতে গেল। গুরুমহাশয়ের অন্যমনস্ক চক্ষুর পূর্ণ জ্যোতি তাহার উপর পড়িল— সে ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন গুরুমহাশয় তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিলেন, "আচ্ছা বল্ তো, হাতছড়ি নিবি না শন্নি্য নিবি।"

কুমুদ বাম হস্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কান্নার সুরে বলিল, "শন্নি্য নেব।"

অমনি শ্যামা ও রামা, শঙ্করা, ভুজো— কুমুদের সমবয়সীর দল —জলপান ও লেখা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সমস্বরে আপত্তি করিল—

"কেন গুরুমহাশয়, আমরা এলুম আগে, আর কুমো এল পরে, ওর শন্নি্য হবে কেন।"

গুরুমহাশয় নিমেষের জন্য বিহ্বল হইলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা কতক্ষণের জন্য! তিনি লাল চক্ষু আরো লাল করিয়া আপত্তিকারীদের এককালে 'শন্মি্য' ও 'হাতছড়ি'র গুরুতর প্রভেদ অনুভূত করাইলেন। বুঝা গেল 'শন্মি্য' দারুণ গুঁতোয় এবং 'হাতছড়ি' তীব্র বেত্রাঘাতে পরিণত হইতে পারে। পাঠশালায় চ্যাঁ-ভ্যাঁ পড়িয়া গেল। সর্দার-পোড়োরা পর্যন্ত সশঙ্ক হইয়া উঠিল। কেননা গুরুমহাশয় বড়োই রাগিয়া উঠিয়া প্রহারলোলুপ দীর্ঘ বেত্রখণ্ড চণ্ডীমণ্ডপতলে জোরে জোরে আস্ফালিত করিতেছিলেন।

ঝড় থামিয়া যায়, আগুন নিভিয়া যায়, তা গুরুমহাশয়ের রাগ কতক্ষণ? সর্দার-পোড়ো নিধিরাম এতক্ষণ হাঁকিয়া হাঁকিয়া 'মহামহিম' লিখিতেছিল এবং বোসদের বড়োবাবুর নাম ফাঁদিয়া কর্জ করিবার কায়দাটা শিখিতেছিল। যেমন সে বুঝিল, গুরুমহাশয়ের রাগ একটু কমিয়াছে, অমনি কাছে আসিয়া তামাকু সাজিতে চাহিল। রামধন ভট্টাচার্যের মুখে হাসি ধরে না। বলিলেন, "তামাক সেজে আনিস্ রে ব্যাটা! তোর বাপের তামাক একটু চুরি করেই না-হয় আন্। আর দেখিস্ যেন খেয়ে পুড়িয়ে শেষ করে আনিস্ নে।"

নিধিরাম দুই লাফে পাঠশালা ত্যাগ করিল। তখন গুরুমহাশয় প্রসন্নচিত্তে ছেলেদের দিকে চাহিলেন। হুঁকাটি হাতে করিয়া বলিলেন, "হুঁকোর জল পুরতে যাবি কে রে।"

"আমি যাব মশায়", "আমি যাব মশায়"— রব চারি দিক হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। ১০-১২ জন উমেদার আপনাদের স্থান ছাড়িয়া গুরুমহাশয়ের সম্মুখে হাজির হইল। এবং পরস্পর পরস্পরের হুঁকোর জল পুরার অসামর্থ্য প্রমাণ করিবার জন্য বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিল। গুরুমহাশয় সেক্‌রাদের ভোলাকেই যথোপযুক্ত পাত্র স্থির করিলেন, কেননা সে জল সমান করিয়া আনিতে পারে।

মোধো বলিল, "ও হুঁকো এঁটো করে মশায়, তাই জল সমান হয়।"

তারিণী বলিল, "ও হুঁকোয় মুখ দিয়ে সূর্যের দিকে জল ছিটোয় আর রামধনুক দেখে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি মশায়।"

গুরুমহাশয় আবার বেত্রাস্ফালন করিলেন। মোধো এবং তারিণী প্রমুখ ক্ষুব্ধ উমেদারগণ পিঠ বাঁচাইবার জন্য তাড়াতাড়ি আপন আপন স্থানে গিয়া বসিল। তখন ভোলা একাকী দাঁড়াইয়া প্রতিমুহূর্তে বেত্রাঘাতের অপেক্ষায় কাঁদিতেছিল। কিন্তু আজ অদৃষ্ট ভালো— হুঁকো উচ্ছিষ্ট করিতে নিষেধ মাত্র করিয়াই গুরুমহাশয় তাহাকে নির্দিষ্ট কাজে বিদায় দিলেন।

বেলা এক প্রহর হইলে জলখাবারের ছুটি হইল। আজ যার যার সিধা দিবার পালা, গুরুমহাশয় তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া ফরমাইশ করিলেন, কী কী জিনিস আনিতে হইবে। চাল, ডাল, তরকারি, তেল, নুনের তো কথাই নাই। আর সব ছেলেকে যে রোজই আটখান করিয়া ঘুঁটে আনিতে হইবে তাহা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা, তা ছাড়া যার বাড়িতে ভালো জিনিস যাহা কিছু সম্প্রতি আসিয়াছে, তাহাও আনিতে হুকুম হইল। বাড়ির লোকে সহজে না দিলে চুরি করার ব্যবস্থাও দেওয়া হইল। আর আদেশ হইল, সর্দার-পোড়োদের কাহাকেও কলার পাতা কাটিয়া আনিতে হইবে, কাহাকেও-বা গুরুমহাশয়ের জল আনিয়া পাকের ঘর পরিষ্কার করিতে হইবে।

পাঠশালার নিকট দিয়া বাগ্‌দি-বুড়ি লাঠি ঠক্‌ঠক্ করিয়া যাইতেছিল। ছুটিপ্রাপ্ত ছেলের দল দেখিয়া তার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। বুড়ি ভাবিল, ছেলেগুলো যদি এক সারি পিপীলিকা হইত তবে অনায়াসে সে শত্রুকুল পদতলে দলিত করিতে পারিত। কিন্তু কেমন নিষ্ঠুর বিধির বিধান, বুড়িকে দেখিয়া আনন্দে ছেলের দল করতালি দিল, তার উদ্দেশে গাহিল—

বাগ্‌দি-বুড়ি গুড়িগুড়ি,
দাঁত নেই খায় তালের মুড়ি।

বুড়ি প্রথমে গান যেন শুনে নাই, এমনি ভান করিয়া গন্তব্য পথে

চলিল। কিন্তু সে রাগিয়া গালি না দিলে শিশুদের আমোদ সম্পূর্ণ হয় না। সুবুদ্ধি-মোধো পিছন দিক হইতে আসিয়া বুড়ির মাথায় ধূলিমুষ্টি ছড়াইয়া দিল। তখন বুড়ি শিশুর দলকে তাড়া করিল এবং তাহাদের পিতৃমাতৃ-উদ্দেশে অভিধানবহির্ভূত অনেক সুকথা কীর্তিত করিয়া আপনার পথে চলিয়া গেল। এইরূপে ছেলেদের প্রাতঃকালীন বিদ্যালাপ সম্পূর্ণ হইল।

মধ্যাহ্নে স্নানাহার করিয়া রামধন ভট্টাচার্য আবার পাঠশালায় আসিয়া বসিলেন— এবার একটি উপাধান সঙ্গে আনিলেন। গুরুমহাশয় বসিয়া হেলান দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আবার তামাকু সেবন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সর্দার-পোড়ো নিধিরাম আসিয়া বলিল যে, ভোলা আর মোধো একজোট হইয়া তালপুকুরের বটগাছে কোকিলের ছানা পাড়িতে গিয়াছে। অমনি নিধে, তারিণী আর দুখিরামের উপর আদেশ হইল, গুরুমহাশয়ের বিশ্রাম করিবার কালে ছোঁড়া দুটাকে ধরিয়া লইয়া আসুক। সর্দার-পোড়ো তিনজনের সঙ্গে পাঠশালার সকল ছেলে ভাঙিয়া চলিল। সেই চৈত্র মাসের দুপুর-রোদে আমবাগানে ছুটাছুটি করিয়া আম পাড়িবার লোভ সকলের মনে জাগিতেছিল, অতএব ছেলেমহলে ভারি আনন্দ পড়িয়া গেল। এ দিকে শ্রীলশ্রীযুক্ত রামধন ভট্টাচার্য গুরুমহাশয় নিশ্চিন্ত হইয়া নাসিকাগর্জন করিতে করিতে সেই গোল গোল জবাফুলের ন্যায় চোখদুটি মুদ্রিত করিলেন। ততক্ষণ তালপুকুরের তালবনের ঘন শীতল ছায়ায় গিয়া সেক্‌রাদের ভোলা সভয়ে চারি দিকে চাহিতেছিল, আবার সুবুদ্ধি-মোধো নিকটেই প্রকাণ্ড বটগাছে উঠিয়া ভাবিতেছিল, কোন্ ডাল দিয়া গেলে কোকিলগুলা তাহাকে দেখিতে পাইবে না।

বীরপুরুষ

মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পাল্‌কিতে মা চ'ড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।

সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে ;
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধূধূ করে যে দিক পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই—
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ, ভাবছ, 'এলেম কোথা!'
আমি বলছি, "ভয় কোরো না মা গো,
ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।"

চোরকাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরু বাছুর নেইকো কোনোখানে,
সন্ধে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে,
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে,
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।

তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
"দিঘির ধারে ওই যে কিসের আলো!"

এমন সময় "হাঁরে রে রে রে রে,"
ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে—
তুমি ভয়ে পাল্‌কিতে এক কোণে
ঠাকুর-দেবৃতা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পাল্‌কি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
"আমি আছি, ভয় কেন মা করো।"

হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, "দাঁড়া খবরদার!
এক পা কাছে আসিস যদি আর
এই চেয়ে দেখ্‌ আমার তলোয়ার—
টুকরো ক'রে দেব তোদের সেরে।"
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল, "হাঁরে রে রে রে রে।"

তুমি বললে, "যাস্‌ নে খোকা ওরে।"
আমি বলি, "দেখো-না চুপ করে।"
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল-তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।

কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।

এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে,
ভাবছ, খোকা গেলই বুঝি ম'রে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, "লড়াই গেছে থেমে।"
তুমি শুনে পাল্‌কি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে।
বলছ, "ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল,
কী দুর্দশাই হত তা না হলে।"

রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা।
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে ;
দাদা বলত, "কেমন ক'রে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে।"
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
"ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।"

সূর্যকিরণের কার্য

সূর্যকিরণের তরঙ্গের বিষয় পূর্বে আমরা কতকটা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু সেই সূর্যকিরণের তরঙ্গ দ্বারা আমাদের পৃথিবীতে কী কী কাজ হইতেছে তাহা লিখিয়া সূর্যের কথা শেষ করিব। প্রথমত সূর্যকিরণের

সাহায্যে আমরা কী করিয়া দেখিতে পাই তাহা বলা আবশ্যক। সূর্য উদয় হইলে সূর্যকিরণের ঢেউ প্রত্যেক বস্তুতে আঘাত করে এবং তাহাদের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারাই আবার আমাদের চক্ষুতে আসিয়া পতিত হয়। আমাদের চক্ষে প্রবেশ করিয়া ঢেউগুলি চক্ষের স্নায়ুগুলিকে যখন চঞ্চল করে তখন প্রত্যেক বস্তুর আকার আমরা মস্তিষ্কে ধারণা করিতে পারি। কতকগুলি বস্তু আছে, তাহারা সেই ঢেউগুলিকে আমাদের চক্ষে ফিরাইয়া না দিয়া বেশির ভাগ ঢেউ তাহাদের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে দেয়, যেমন কাঁচ। সেই হেতু এই শ্রেণীর বস্তুগুলিকে আমরা স্বচ্ছ পদার্থ বলিয়া থাকি। আবার এমন কতকগুলি ধাতু আছে যাহারা সেই ঢেউগুলিকে তাহাদের মধ্যে কতকটা প্রবেশ করিতে দেয় ও অধিকাংশই আমাদের চক্ষে ফিরাইয়া দেয়, যেমন উজ্জ্বল রৌপ্য, ইস্পাত ইত্যাদি। দর্পণে যখন মুখ দেখি তখন সূর্যের ঢেউ প্রথমে আমাদের মুখে আসিয়া পড়িয়া আয়নায় ফিরিয়া যায়, পুনরায় তাহারা আয়না হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন আমাদের চক্ষের তারার মধ্যে প্রবেশ করে তখন নিজের মুখ নিজে দেখিতে পাই। সূর্যকিরণের আর-একটি গুণ আছে। ধরিতে গেলে পৃথিবীতে কোনো জিনিসের রঙ নাই। সূর্য-কিরণ হইতেই সকলে নানা রঙ পাইয়া থাকে। সূর্যকিরণের মধ্যে যে রামধনুকের সাতটা রঙ আছে, এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু সূর্যকিরণের সেই সাতটা রঙ কেমন ভাবে আছে সেটা বলিলে বোধ করি কাহারো বিরক্তি বোধ হইবে না।

আমরা পূর্বে সূর্যকিরণকে তরঙ্গ বলিয়াছি। এখন বুঝিতে হইবে, অনেকগুলি ভিন্ন আয়তনের তরঙ্গ একত্রে সার বাঁধিয়া আসিতেছে। সাতটা রঙ সাতটা বিভিন্ন আয়তনের ঢেউ। লাল রঙের ঢেউগুলি সকলের চেয়ে বড়ো। কিন্তু ঢেউগুলি আয়তনে পৃথক হইলেও তাহাদের গতিবেগের পরিমাণে কোনো ভেদ নাই, সব ঢেউই প্রতি সেকেণ্ডে ৯৩০০০ ক্রোশ চলে। যে ঢেউগুলি দ্বারা ভায়লেট নামক

এক প্রকার বেগুনি রঙের আলো হয় তাহারা সর্বাপেক্ষা ছোটো ও কার্যক্ষম। তা ছাড়া কমলালেবুর রঙ, সবুজ রঙ, নীল রঙ, ঘোর নীল রঙের ঢেউগুলি ভিন্ন আয়তন ধরিয়া আছে। এক ইঞ্চি জায়গায় যদি ৩৯০০০ লাল রঙের ঢেউ থাকে তা হলে সেই জায়গায় ৫৭০০০ বেগুনি রঙের ঢেউ থাকে, ইহা পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে। এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারো যে, সূর্যকিরণের এই-সকল বিভিন্ন রঙের ঢেউগুলি যখন আমাদের চক্ষে আঘাত করিতেছে তখন আমরা রঙিন আলো সর্বদা দেখিতে পাই না কেন। নিয়মিত মাপে লাল, কমলালেবুর রঙ, হলদে, সবুজ, নীল, ঘোর নীল ও বেগুনি এই কয়টি রঙ যদি একত্রে মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে সাদা রঙ দাঁড়াইবে। পরীক্ষা করিতে চাও তো একটি গোল মোটা কাগজে এই রঙগুলি ক্রমান্বয়ে সারি সারি মাখাইয়া খুব জোরে ঘুরাইবে, সেই রঙগুলির পরিবর্তে কেবল সাদা রঙ দেখাইবে। কেবল সূর্যের রঙের মতো বিশুদ্ধ রঙ এখানে পাওয়া যায় না বলিয়া যতটা সাদা হওয়া উচিত ততটা সাদা দেখায় না। সেইরূপ সূর্যের আলোকের বিভিন্ন রঙের ঢেউগুলি একত্রে মিলিয়া এক সময়েই তোমার চক্ষে আঘাত করিতেছে বলিয়া তুমি এই শুভ্র আলোক দেখিতে পাইতেছ। নানা দ্রব্য নানা রঙের— ইহার অর্থ কী। তাহার কারণ এই, এক-একটা জিনিস সূর্যকিরণের এক-একটা রঙের ঢেউ আপনার মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না। মনে করো, গোলাপফুল সূর্যালোকের সমুদয় বর্ণ গ্রহণ করিতে পারে, কেবল লাল রঙটা পারে না ; এইজন্য লাল রঙ গোলাপ ফুলের কাছ হইতে ফিরিয়া আসে, সুতরাং লাল রঙটাই আমরা দেখিতে পাই, আর কোনো রঙ দেখিতে পাই না। তাই গোলাপকে লাল বলি। গাছের পাতাগুলি সেইরূপ সূর্যের অন্য রঙের ঢেউ-সকল আপনাদের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া কেবল সবুজ রঙের ঢেউ ফিরাইয়া দেয়, সেই ঢেউ ফিরিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষে আঘাত করিলে আমরা পাতাগুলির সবুজ রঙ দেখিতে পাই। সাদা

কাপড় সূর্যের কোনো রঙের ঢেউ আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না, কিন্তু কালো কাপড় সমস্তটাই আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয়, কোনো রঙই ফিরাইয়া দেয় না। গাছের পাতা বা ফুল যে-সকল ঢেউ তাহাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া রাখিয়া দেয়, তাহাদেরই সাহায্যে তাহারা নিজের আহারের জন্য রস প্রস্তুত করে ও আহার হজম করে। সূর্যকিরণে এই যেমন আলোকের ঢেউ আছে, সেরূপ উত্তাপেরও ঢেউ আছে, আলো যেমন ঢেউ উত্তাপও তেমনি ঢেউ। আলোকের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাপের ঢেউও দেখিতে পাওয়া যায় না। সূর্যের উত্তাপের ঢেউগুলি যদিও অদৃশ্য হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, তথাপি সেইগুলির দ্বারাই আমাদের পৃথিবীর অধিকাংশ কার্য সম্পন্ন হইতেছে। এই উত্তাপের ঢেউ পৃথিবীতে আসিয়া জলকে বাষ্পে পরিণত করে। জলীয় বাষ্প হাওয়া হইতে হালকা বলিয়া উপরে উঠিয়া যায়। সেইখানে গিয়া ঐ বাষ্প ঠাণ্ডায় জমিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলের কণা সৃষ্টি করে। জলের কণাগুলি তখন বাতাসে ভাসিতে থাকে, এবং তাহারাই আবার বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে পতিত হইয়া নদ-নদী সৃষ্টি করে। উত্তাপের এই ঢেউগুলি প্রথমত মাটিকে গরম করে, এই গরম মাটির সংস্পর্শে বাতাস গরম ও হালকা হয় বলিয়া ঝড় হয়। এই ঢেউগুলি ভূমিকে উত্তপ্ত করিয়া উদ্ভিদজাতিকে বর্ধিত করে। আমাদের শরীরের উত্তাপ আমরা দুই উপায়ে পাইয়া থাকি। প্রথমত, এই ঢেউগুলি আমাদের গাত্রে আঘাত করে বলিয়া। দ্বিতীয়ত, উদ্ভিদগুলির নিকট হইতে। উদ্ভিদগুলির নিকট যে কী উপায়ে উত্তাপ পাই তাহা বলিতেছি। পূর্বে বলিয়াছি যে উদ্ভিদেরা সূর্যের আলো ও উত্তাপের ঢেউ নিজের শরীর-রক্ষার জন্য ব্যবহার করে। আমরা হয় সেই উদ্ভিদ খাই, নয়তো যে-সকল জন্তুরা সেই উদ্ভিদ খায় তাহাদের আহার করি। যখন আমাদের আহার হজম হয় তখন উদ্ভিদ যে-উত্তাপ সূর্যকিরণ হইতে প্রথমে গ্রহণ করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল তাহাই আবার

আমাদের শরীরে আসিয়া প্রবেশ করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করে। বৃক্ষ হইতে পাথুরে কয়লার উৎপত্তি। বৃক্ষ এককালে সূর্য হইতে যে উত্তাপ লইয়াছিল তাহাই এখন কয়লাতে লুকানো আছে। এই কয়লার সাহায্যে রেলগাড়ি, জাহাজ ও পৃথিবীর কতশত কল চলিতেছে।

আকবর শাহের উদারতা

একজন প্রাচীন ইংরেজ ভ্রমণকারী আকবর শাহের উদারতা সম্বন্ধে একটি গল্প করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আকবর শাহের মাতৃভক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। এমন-কি, এক সময়ে যখন তাঁহার মা পাল্‌কি চড়িয়া লাহোর হইতে আগ্রায় যাইতেছিলেন তখন আকবর এবং তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্য বড়ো বড়ো ওমরাহ্‌গণ নিজের কাঁধে পাল্‌কি লইয়া তাঁহাকে নদী পার করিয়াছিলেন। সম্রাটের মা সম্রাটকে যাহা বলিতেন তিনি তাহাই পালন করিতেন। কেবল আকবর শা মায়ের একটি আজ্ঞা পালন করেন নাই। সম্রাটের মা সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, পর্টুগীজ নাবিকগণ একটি মুসলমান জাহাজ লুট করিয়া একখণ্ড কোরান গ্রন্থ পাইয়াছিল, তাহারা সেই গ্রন্থ একটি কুকুরের গলায় বাঁধিয়া বাজনা বাজাইয়া অর্মজ শহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট-মাতা আকবরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, একখণ্ড বাইবেল গাধার গলায় বাঁধিয়া আগ্রা শহর ঘোরানো হউক। সম্রাট তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "যে কার্য একদল পর্টুগালবাসীর পক্ষেই নিন্দনীয় সে কার্য একজন সম্রাটের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নাই। কোনো ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলে ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়। অতএব আমি একখানা নিরীহ গ্রন্থের উপর দিয়া প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করিতে পারিব না।"

মাঝি

আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ওই পারে—
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকো
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে,
জাল টেনে নেয় জেলে;
গোরু মহিষ সাঁতরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।
সন্ধে হলে যেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে,
শুধু রাত-দুপুরে
শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে
ঝাউডাঙাটার 'পরে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

শুনেছি ওর ভিতর দিকে
আছে জলার মতো।
বর্ষা হলে গত
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সেথায়
চখাচখি যত।

তারি ধারে ঘন হয়ে
জন্মেছে সব শর,
মানিকজোড়ের ঘর,
কাদাখোঁচা পায়ের চিহ্ন
আঁকে পাঁকের 'পর।
সন্ধ্যা হলে কতদিন মা,
দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে
দেখেছি একমনে—
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে
সাদা কাশের বনে—
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

এপার-ওপার দুই পারেতেই
যাব নৌকো বেয়ে।
যত ছেলে মেয়ে
স্নানের ঘাটে থেকে আমায়
দেখবে চেয়ে চেয়ে।
সূর্য যখন উঠবে মাথায়
অনেক বেলা হলে—
আসব তখন চ'লে
"বড়ো খিদে পেয়েছে গো,
খেতে দাও মা" ব'লে।
আবার আমি আসব ফিরে,
আঁধার হলে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে।

বাবার মতো যাব না মা,
বিদেশে কোন্ কাজে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

ন্যায়ধর্ম

প্রুসিয়ার ‘মহৎ’-উপাধিপ্রাপ্ত সম্রাট ফ্রেডরিক রাজধানী হইতে কিছু দূরে একটি বাগানবাড়ি নির্মাণের সংকল্প করিয়াছিলেন। যখন সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল তখন শুনিতে পাইলেন যে, একজন কৃষকের একটি শস্য চূর্ণ করিবার জাঁতাকল-গৃহ মাঝে পড়াতেই তাঁহার বাগান সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না। বিস্তর টাকার প্রলোভনেও কৃষক তাহার গৃহ উঠাইয়া লইতে রাজি হয় নাই শুনিয়া সম্রাট কৃষককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এত টাকা পাইতেছ, তবু কেন ঘর ছাড়িতেছ না।” কৃষক উত্তর করিল, “ইহা আমার পৈতৃক গৃহ। ঐখানেই আমার পিতা তাঁহার জীবন নির্বাহ করিয়াছেন ও মরিয়াছেন এবং ঐখানেই আমার পুত্রের জন্ম হইয়াছে, আমি উহা বেচিতে পারিব না।”

সম্রাট কহিলেন, “আমি ঐ স্থানে আমার প্রাসাদ নির্মাণ করিতে চাই।”

কৃষক কহিল, “মহারাজ বোধ করি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ঐ জাঁতাকলের ঘর আমার প্রাসাদ।” সম্রাট কহিলেন, “তুমি যদি বিক্রয় না কর তো ঐ গৃহ আমি কাড়িয়া লইতে পারি।” কৃষক কহিল, “না, পারেন না, বর্লিন নগরে বিচারক আছে।”

এই কথা শুনিয়া সম্রাট কৃষকের ঘরে আর হস্তক্ষেপ করিলেন

না। তিনি ভাবিলেন, রাজারা আইন গড়িতে পারেন কিন্তু আইন ভাঙিতে পারেন না। কৃষকের সেই জাঁতাকল আজ পর্যন্ত সম্রাটের উদ্যানে রহিয়াছে।

গুজরাটের রানীর সম্বন্ধে এইরূপ আর-একটি গল্প প্রচলিত আছে। বহু পূর্বের কথা। তখন গুজরাট সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। রানীর নাম মীনল দেবী। তাঁহার রাজত্বকালে ধোলকা গ্রামে তিনি 'মীনল তলাও' নামে একটি পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। ঐ পুষ্করিণীর পূর্ব দিকে একটি দুষ্টপ্রকৃতি রমণীর বাসগৃহ ছিল। সেই গৃহ থাকাতে পুষ্করিণীর আয়তন-সামঞ্জস্যের ব্যাঘাত হইতেছিল। রানী অনেক অর্থ দিয়া সেই ঘর ক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহকর্ত্রী মনে করিল, 'পুষ্করিণী খনন করাইয়া রানী যেরূপ কীর্তিলাভ করিবেন, পুষ্করিণী খননের ব্যাঘাত করিয়া আমারও তেমনি একটা নাম থাকিয়া যাইবে।' এই বলিয়া সে গৃহ বিক্রয় করিতে অসম্মত হইল। রানী কিছুমাত্র বলপ্রয়োগ করিলেন না। গৃহ সেইখানেই রহিল। আজিও মীনল তলাওয়ের পূর্ব দিকের সীমা অসমান রহিয়াছে। সেই অবধি উক্ত প্রদেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে, "ন্যায়ধর্ম দেখিতে চাও তো মীনল তলাও যাও।"

আলোক ও উত্তাপ

আলোক— সূর্যেরই হউক বা অন্য কোনো জ্বলন্ত বস্তুরই হউক— ঈথরের ঢেউরূপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরিত হয়। সূর্যকে পরিত্যাগ করিবার এবং আমাদের চক্ষে পৌঁছিবার মধ্যে আলোক ঈথরের ঢেউ আকারে অবস্থান করে। কিন্তু আলোক কী? কী গুণের প্রভাবে সূর্য কিংবা অন্য একটি জ্বলন্ত বস্তু আলোকের আধার হয়? কী গুণের প্রভাবে একটি জ্বলন্ত বস্তু ঈথরকে তরঙ্গিত করিতে

পারে এবং অপরাপর বস্তু, যাহা অন্ধকারে দেখা যায় না, তাহারা করিতে পারে না? অন্ধকার রাত্রিতে একটি লোহার গোলা দেখা যায় না। কিন্তু সকলেই জানেন যে উত্তাপ দিতে দিতে ইহা ক্রমে রক্তবর্ণ হইয়া চক্ষুর গোচর হয়। এই গোলক পূর্বে অন্ধকারে সম্পূর্ণ-রূপে অদৃশ্য ছিল, উত্তাপ দিতে দিতে ইহাতে কী পরিবর্তন হইল যে ইহা সহসা রক্তবর্ণ হইয়া চক্ষুর গোচর হইল। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথম জানা আবশ্যক যে পদার্থসমুদয় কী প্রকারে গঠিত। নানা প্রমাণের দ্বারা পণ্ডিতেরা জানিয়াছেন যে, পদার্থ-সকল ছাড়া-ছাড়া কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। সেই কণাগুলি আকর্ষণের নিয়মে কাছাকাছি দল বাঁধিয়া আছে বটে, কিন্তু একেবারেই গায়ে গায়ে লাগিয়া নাই। তাহাদের মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে। এই কণা-গুলি এত ছোটো যে ইহাদিগকে চোখে দেখিতে পাই না, কিন্তু যখন অনেকগুলি একত্রে মিলিয়া থাকে তখনই আমরা তাহাদিগকে বস্তু-বিশেষ বলিয়া দেখিতে পাই। এই কণাকে অণু বলিয়া থাকি। আবার এই অণুগুলিকে কোনো প্রক্রিয়ায় ভাগ করিয়া ফেলিলে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অণু পাওয়া যায়, তাহাকে আর কিছুতেই ভাগ করা যায় না। তাহাকে আমরা পরমাণু বলি। এক্ষণে জানিবার চেষ্টা করা যাউক, এই-সমস্ত অণু ও পরমাণু কী ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, ইহারা কি স্থির অথবা গতিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা অনেক প্রমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পদার্থের অণু ও পরামাণু স্থির নহে, তাহারা গতিবিশিষ্ট; অতি দ্রুত গতিতে ইহারা বিকম্পিত হইতেছে। অণুরাশির বিকম্পনে পদার্থে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। কোনো বস্তুই একেবারে উত্তাপশূন্য নহে, উত্তাপ-সংযোগে পদার্থের অণুবিকম্পন ক্রমেই বাড়িতে থাকে অর্থাৎ তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিক স্থান জুড়িয়া দুলিতে থাকে। অণুবিকম্পন যতই বাড়িতে থাকে ততই তাহারা উষ্ণ ও উষ্ণতর হয়।

মনে করো একটি লোহার গোলা তোমার শরীর অপেক্ষা ঠাণ্ডাও

নহে গরমও নহে, অর্থাৎ গোলার অণু যে স্থান জুড়িয়া এবং যে বেগে দোলে তোমার শরীরের অণু ঠিক ততটুকু স্থান জুড়িয়া এবং সেই বেগে দুলিতে অর্থাৎ বিকম্পিত হইতে থাকে। এক্ষণে যদি উত্তাপ প্রদান করিয়া এই গোলাটিকে পূর্বাপেক্ষা গরম করিয়া ইহার নিকট তোমার হাত লইয়া যাও তবে দেখিবে তোমার হাতে তাপ লাগিতেছে। তুমি তো গোলা স্পর্শ কর নাই, তবে তোমার হাতে তাপ লাগে কেন? বলা হইয়াছে, ঈথর সর্বত্র এবং সকল পদার্থের ভিতর বর্তমান; উত্তাপ দিতে দিতে গোলার অণুবিকম্পন যত বাড়িতে থাকে ঈথর সাগরে ততই প্রবল ও প্রবলতর তরঙ্গ উঠিতে থাকে। এই তরঙ্গমালা চতুর্দিকে ধাবিত হয়, এবং নিকটে যদি কোনো শীতল বস্তু থাকে তবে ঈথর তাহার মধ্যস্থিত অণুগুলিকে আপনার কিয়দংশ গতি দিয়া তাহাদের বিকম্পন বাড়াইয়া তোলে, অর্থাৎ সেই শীতল বস্তু ক্রমে উষ্ণ হইয়া উঠে। যে-কোনো বস্তু থাকিলেই যে এরূপ হইবে এমত নহে। এমন অনেক বস্তু আছে যাহাদের অণুগুলি ঈথরের গতি গ্রহণ না করিয়া অবাধে নিজের মধ্য দিয়া যাইতে দেয়। যাহা হউক, মনুষ্যহস্ত এরূপ বস্তু নহে, কাজেই উষ্ণ গোলা সম্মুখে ধরাতে তাহার অণুবিকম্পন বাড়ে ও আমাদের স্পর্শস্নায়ুর সাহায্যে হাতে তাপ অনুভব করি। উত্তাপ দিতে দিতে গোলাটি কেন রক্তবর্ণ হইয়া দৃষ্টিগোচর হয় তাহার কারণ বলিতেছি।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, উত্তাপ দিলে পদার্থের পূর্বতন কম্পনগুলি বাড়িয়া উঠে। কিন্তু কেবল যে তাহাই হয় এমন নহে, পূর্বতন কম্পন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন ও দ্রুততর কম্পনের উৎপত্তি হয়। নূতন কম্পনগুলি দ্রুততর বলিয়া এই বুঝাইতে চাই যে, পূর্বতন কম্পন অপেক্ষা ইহারা অল্প সময়ে সম্পাদিত হয়। উত্তাপ দিতে দিতে যখন একটি বিশেষ মাত্রায় দ্রুত কম্পন উৎপন্ন হয় তখন গোলা রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। এই কম্পনজনিত ঈথর-তরঙ্গ যখন আমাদের চক্ষের পশ্চাতে যে দৃষ্টি-স্নায়ু-জাল আছে তাহা উত্তেজিত করে, তখন আমরা

লাল বর্ণ দেখিতে পাই। উত্তাপ দিতে দিতে নূতন নূতন দ্রুততর কম্পন উৎপন্ন হইতে থাকে এবং ক্রমে পীত হরিৎ নীল ভায়লেট প্রভৃতি নূতন কিরণ জন্মিতে থাকে। এক্ষণে তবে দেখিলাম যে, আলোক ও উত্তাপ উভয়েই ঈথর-তরঙ্গাকারে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে যায়। নদীর স্রোতের মধ্যে যদি একখানা কাপড়ের ব্যবধান দেওয়া যায়, তবে নদীর ঢেউয়ের কতক অংশ সেই কাপড়ের ব্যাঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসে, কতক অংশ সেই কাপড়ের মধ্যে শোষিত হইয়া তাহাকে ভিজাইয়া তোলে, এবং কতক অংশ সেই কাপড় ভেদ করিয়া যায়। তেমনি উত্তাপ ও আলোকের ঢেউ কোনো বস্তুতে আঘাত করিবামাত্র প্রায়ই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। যে দিক হইতে ঢেউ আসিতেছিল আঘাত পাইবামাত্র কতকগুলি ঢেউ সেই দিকে ফিরিয়া যায়; সেই ঢেউগুলিকে প্রতিফলিত বলা হয়। যে ঢেউগুলি বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করে (সকল বস্তুর ভিতরেই ঈথর আছে) তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ঐ বস্তুর অণুবিকম্পন বাড়াইয়া উহাকে উষ্ণ করিয়া তোলে (এই তরঙ্গগুলিকে শোষিত হয় বলা যায়) এবং অন্যগুলি বাহির হইয়া যায়। বায়ুর ন্যায় এমন অনেক বস্তু আছে যাহার উপর আঘাত করিলে অধিকাংশ তরঙ্গ বাহির হইয়া যায়, অল্পমাত্র প্রতিফলিত হয় এবং প্রায় কিছুই শোষিত হয় না; উজ্জ্বল ধাতুতে আঘাত করিলে অধিকাংশ তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়, অল্পমাত্র শোষিত হয়, কিন্তু কিছুই বাহির হইয়া যায় না। দরজা-জানালার উপর আঘাত করিলে বেশির ভাগ তরঙ্গ শোষিত হয়, অল্পমাত্র প্রতিফলিত হয়, কিন্তু কিছুই বাহির হইয়া যাইতে পারে না। আবার এমন অনেক বস্তু আছে যাহা উত্তাপ-তরঙ্গ গ্রহণ করিতে পারে, আলোক-তরঙ্গ গ্রহণ করিতে পারে না; আবার কোনো বস্তু আলোক-তরঙ্গ শোষণ করে এবং উত্তাপ-তরঙ্গ অবিরোধে আপনাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে দেয়। একই বস্তু আবার ভিন্ন তরঙ্গের কোনোটিকে বা শোষণ করে,

কোনোটিকে বা ছাড়িয়া দেয়। একখানি লালবর্ণের কাচ কেবল লালবর্ণের তরঙ্গ ছাড়িয়া দেয়, একখানি নীলবর্ণের কাচ কেবল নীল ঢেউগুলি ছাড়িয়া দেয়, অপরগুলি শোষণ করে। আবার যেরূপ লালবর্ণের আলোক আছে সেইরূপ নানা বর্ণের উত্তাপ-তরঙ্গও আছে। একখানি শুভ্র কাচফলক সূর্যের উত্তাপ-তরঙ্গ প্রায় ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু জ্বলন্ত অঙ্গারের উত্তাপ এবং পৃথিবী যে উত্তাপ বিকিরণ করে সে-সমস্ত শোষণ করিয়া লয়। উনানের সম্মুখে বসিলে গায়ে তাপ লাগিবে, কিন্তু একটি কাচফলকের ব্যবধান দিয়া বসিয়া দেখিয়ো গায়ে তাপ লাগিবে না। অথচ কাচের মধ্য দিয়া রৌদ্রতাপ আসে। তোমরা বোধ করি এখন বুঝিয়া থাকিবে যে, দিনের বেলা জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া দিলে ঘর কেন অন্ধকার হয়। দেওয়াল জানালা প্রভৃতি দ্রব্য ঈথরের গতি কাড়িয়া লয়, ঈথর-তরঙ্গকে আপনাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে দেয় না। জানালা বন্ধ না করিয়া যদি সার্শি বন্ধ করিয়া দাও তবে ঘরে আলোক দেখিবে, কারণ পূর্বে বলিয়াছি যে কাচ আলোক-তরঙ্গ ছাড়িয়া দেয়। আর-একটি কথা বলি, রাত্রে কেন সূর্যালোক পাই না। আমাদের পৃথিবী গোল, এক সময়ে ইহার এক অর্ধে সূর্যকিরণ আঘাত করিতে পারে ; অপরার্ধের কোনো স্থলে পৌঁছিতে হইলে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু পৃথিবী স্বচ্ছ নহে অর্থাৎ আলোক-তরঙ্গ অবিরোধে ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। যদি পৃথিবী স্বচ্ছ উপাদানেও নির্মিত হইত তাহা হইলেও ইহা ফুঁড়িয়া আলোক-তরঙ্গ যাইতে পারিত কি না সন্দেহ। এক ফুট জল ভেদ করিয়া আলোক-তরঙ্গ অনায়াসে বাহির হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু ২০ ফুট জলের ভিতর দিয়া আলোক পাঠাইলে দেখিবে যে অর্ধেক আলো শোষিত হইয়াছে। পৃথিবী এত বৃহৎ যে, কাচের বা জলের ন্যায় স্বচ্ছ পদার্থে নির্মিত হইলেও হয়তো আলোক-তরঙ্গকে অতিক্রম করিয়া যাইতে দিত না।

অচলগড়ের রাজা

মাড়োয়ারের রাজপুত রাজা যশোবন্ত দিল্লীর বাদশা আরঙ্গজীবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অধীনে নহর খাঁ নামক একজন হিন্দু রাজপুত বীর ছিলেন। নহর খাঁ বলিয়া তাঁহাকে সকলে ডাকিত বটে কিন্তু তাঁহার আসল নাম ছিল মুকুন্দ দাস। এক সময়ে তিনি বাদশাহকে অমান্য করাতে বাদশাহ তাঁহার উপর চটিয়া যান। বাদশা হুকুম দিলেন, "কোনো প্রকার অস্ত্র না লইয়া মুকুন্দকে একটা বাঘের খাঁচার মধ্যে গিয়া বাঘের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে।" মুকুন্দ বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।" নির্ভয়ে খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি বাঘকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে, তুমি তো মিঞা সাহেবের বাঘ, একবার যশোবন্তের বাঘের কাছে এসো দেখি।" এই বলিয়া চোখ রাঙাইয়া তিনি বাঘের দিকে চাহিলেন। হঠাৎ কী কারণে বাঘের এমনই ভয় হইল যে, সে মুখ ফিরাইয়া লেজ গুটাইয়া সুড়সুড় করিয়া কোণে চলিয়া গেল। রাজপুত বীর কহিলেন, "যে শত্রু ভয়ে পালায় তাহাকে তো আমরা মারিতে পারি না। তাহা আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ।" এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া বাদশা তাঁহাকে পুরস্কার দিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

বাঘেরা অত্যন্ত ভয়ানক জানোয়ার বটে কিন্তু এক-এক সময়ে তাহারা হঠাৎ অত্যন্ত সামান্য কারণে কেমন ভয় পায়। একটা গল্প বোধ করি তোমরা সকলে শুনিয়া থাকিবে— একদল ইংরেজ সুন্দরবনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। যখন আহারের সময় হইল, বনের মধ্যে আসন পাতিয়া সকলে আহারে বসিয়া গেলেন। এমন সময়ে জঙ্গলের ভিতর হইতে একটা বাঘ লাফ দিয়া তাঁহাদের কাছে আসিয়া পড়িল। বাঘ দেখিয়া একটি মেমসাহেব তাড়াতাড়ি ছাতা খুলিয়া তাহার মুখের সামনে ধরিলেন। হঠাৎ অদ্ভুত একটা ছাতা

খোলার ব্যাপার দেখিয়া বাঘের এমনই ভয় লাগিল যে, সেখানে অধিকক্ষণ থাকা সে ভালো বোধ করিল না, চট্‌পট্‌ ঘরে ফিরিয়া গেল। এমন শোনা যায়, বাঘের চোখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে বাঘ আক্রমণ করিতে সাহস করে না। এটা লোকের মুখে শোনা কথা। কথাটার সত্যমিথ্যা ঠিক বলিতে পারি না। নিজে পরখ করিয়া যে বলিব এমন সুবিধা বা সাধও নাই। পরখ করিতে গেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিবার অবকাশ না থাকিতে পারে।

নহর খাঁর আর-একটি গল্প বলি। রাজপুতদের এক প্রকার খেলা আছে। ঘোড়ায় চড়িয়া একটা গাছের নীচে দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিতে হয়। ঘোড়া যখন ছুটিতেছে তখন গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে হয়, ঘোড়া পায়ের নীচে দিয়া চলিয়া যায়। বাদশাহের এক ছেলে একবার নহর খাঁকে এই খেলা খেলিতে হুকুম করেন। নহর রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমি তো আর বাঁদর নই। রাজা যদি খেলা দেখিতে ইচ্ছা করেন তো লড়াই করিতে হুকুম দিন, একবার তলোয়ারের খেলাটা দেখাইয়া দিই।" বাদশাহ-পুত্র বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি সৈন্য লইয়া সিরোহীর রাজা সুরতানকে ধরিয়া লইয়া আইস।" নহর রাজি হইলেন। সিরোহীর রাজা অচলগড় নামক তাঁর এক পর্বতের দুর্গের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। নহর বাছা-বাছা একদল লোক লইয়া গভীর রাত্রে গোপনে দুর্গের মধ্যে গিয়া রাজাকে নিজের পাগড়ির কাপড়ে বাঁধিয়া ফেলিলেন। রাজাকে এইরূপে বন্দী করিয়া নহর তাঁহাকে দিল্লীতে নিজের প্রভু যশোবন্ত সিংহের নিকটে আনিয়া দিলেন। যশোবন্ত সুরতানকে বাদশার সভায় লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন। এবং সেইসঙ্গে কথা দিলেন যে, বাদশাহের সভায় কেহ তাঁহাকে কোনোরূপ অপমান করিতে পারিবেন না। সিরোহীর রাজাকে আরঞ্জীবের সভায় লইয়া যাওয়া হইল। দস্তুর আছে যে, বাদশাহের সভায় গেলে বাদশাহকে সকলেরই নত হইয়া সেলাম করিতে

হয়। সেই দস্তুর অনুসারে সকলে সুরতানকে সেলাম করিতে বলিল। তিনি সদর্পে মাথা তুলিয়া বলিলেন, "আমার প্রাণ বাদশাহের হাতে— কিন্তু আমার মান আমার নিজের হাতে। কখনো কোনো মানুষের কাছে মাথা নোয়াই নাই, কখনো নোয়াইব না।" সভার লোকেরা আশ্চর্য হইয়া গেল, কিন্তু যশোবন্তের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কেহ তাঁহাকে কিছু বলিল না। তাহারা একটা কৌশল করিল। একটি ছোটো দরজার মতো ছিল, তাহার মধ্য দিয়া গলিতে হইলে মাথা নিচু না করিলে চলে না— সেই দরজার ভিতর দিয়া তাঁহাকে বাদশাহের সম্মুখে যাইতে বলিল। কিন্তু পাছে মাথা হেঁট হয় বলিয়া তিনি আগে পা গলাইয়া দিয়া মাথা বাহির করিয়া আনিলেন। বাদশাহ রাজার এই নির্ভীকতায় রাগ না করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি কোন্ রাজ্য পুরস্কার চাও, আমি দিব।" রাজা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আমার অচলগড়ের মতো রাজ্য আর কোথায় আছে? সেইখানেই আমাকে ফিরিয়া যাইতে দিন।" বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাই অনুমতি করিলেন। এই রাজা এবং রাজবংশ চিরদিন আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কখনোই মোগল-সম্রাটের দাস হন নাই। যিনি বন্দী অবস্থাতেও নিজের মান রাখিয়া চলিতে পারেন তাঁহাকে দমন করিতে পারে কে?

কাগজের নৌকা

ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ-নৌকাখানি,
লিখে রাখি তাতে আপনার নাম,
লিখি আমাদের বাড়ি কোন্ গ্রাম,
বড়ো বড়ো ক'রে মোটা অক্ষরে
যতনে লাইন টানি।
যদি সে নৌকা আর-কোনো দেশে
আর-কারো হাতে পড়ে গিয়ে শেষে
আমার লিখন পড়িয়া তখন
বুঝিবে সে অনুমানি,
কার কাছ হতে ভেসে এল স্রোতে
কাগজ-নৌকাখানি।

আমার নৌকা সাজাই যতনে
শিউলি-বকুলে ভরি।
বাড়ির বাগানে গাছের তলায়
ছেয়ে থাকে ফুল সকালবেলায়,
শিশিরের জলে করে ঝল্‌মল্
প্রভাতের আলো পড়ি।
সেই কুসুমের অতি ছোটো বোঝা,
কোন্ দিক পানে চ'লে যায় সোজা,
বেলাশেষে যদি পার হয়ে নদী
ঠেকে কোনোখানে যেয়ে;

প্রভাতের ফুল সাঁঝে পাবে কূল
কাগজের তরী বেয়ে।

আমার নৌকা ভাসাইয়া জলে
চেয়ে থাকি বসি তীরে।
ছোটো ছোটো ঢেউ উঠে আর পড়ে,
রবির কিরণে ঝিকিমিকি করে,
আকাশেতে পাখি চ'লে যায় ডাকি,
বায়ু বহে ধীরে ধীরে।
গগনের তলে মেঘ ভাসে কত
আমারি সে ছোটো নৌকার মতো,
কে ভাসালে তায়, কোথা ভেসে যায়,
কোন্ দেশে গিয়ে লাগে!
ওই মেঘ আর তরণী আমার
কে যাবে কাহার আগে।

বেলা হলে শেষে বাড়ি থেকে এসে
নিয়ে যায় মোরে টানি।
আমি ঘরে ফিরি, থাকি কোণে মিশি,
যেথা কাটে দিন সেথা কাটে নিশি,
কোথা কোন্ গাঁয়ে ভেসে চ'লে যায়
আমার নৌকাখানি।
কোন্ পথে যাবে কিছু নাই জানা,
কেহ তারে কভু নাহি করে মানা
ধ'রে নাহি রাখে, ফিরে নাহি ডাকে,
ধায় নব নব দেশে।

কাগজের তরী, তারি 'পরে চড়ি

মন যায় ভেসে ভেসে।

রাত হয়ে আসে, শুই বিছানায়,

মুখ ঢাকি দুই হাতে।

চোখ বুজে ভাবি— এমন আঁধার,

কালি দিয়ে ঢালা নদীর দুধার,

তারি মাঝখানে কোথায় কে জানে

নৌকা চলেছে রাতে।

আকাশের তারা মিটিমিটি করে,

শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে,

তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি খুঁজি

তীরে তীরে ফিরে ভাসি।

ঘুম লয়ে সাথে চড়েছে তাহাতে

ঘুম-পাড়ানিয়া মাসি।

—

'ছুটির পড়া'র সমস্ত গদ্য রচনা 'বালক' পত্রে (১২৯২) প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পাঠ্য পুস্তকটির প্রকাশ-কাল হইতে রবীন্দ্রনাথ-রচিত বলিয়া পরিচিত হইলেও ইহার অন্তর্গত সব রচনা রবীন্দ্রনাথের নয়।

এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন-পুস্তক-প্রকাশ সমিতি -কর্তৃক প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ' (পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৌষ ১৩৮৯) গ্রন্থের অন্তর্গত 'রবীন্দ্রনাথ-রচিত সংকলিত ও সম্পাদিত বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থে'র স্বচী অংশ (পৃ. ২৬৬) হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ মুদ্রিত হইল :

"...কার্যাধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ বস্তুত বালকের সম্পাদক ছিলেন এবং সেই স্থত্রে অপরের রচনা যা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ত, অধিকাংশ রচনা, বিশেষত তরুণ আত্মীয়-আত্মীয়া ও বন্ধুপরিজনদের রচনা, তিনি বিশেষ-ভাবে সংশোধন করে প্রকাশ করেন এরূপ অনুমান।...

পরবর্তীকালে ছাত্রপাঠ্য 'ছুটির পড়া' সংকলন করার সময় রবীন্দ্রনাথ বালকে প্রকাশিত আত্মীয় বন্ধুদের কয়েকটি রচনা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন ; 'ছুটির পড়া' থেকে রবীন্দ্রনাথ-সংকলিত তাঁর বিদ্যালয়পাঠ্য অন্য কোনো কোনো গ্রন্থেও গৃহীত হয়।"

বর্তমান মুদ্রণের (মার্চ ১৯৮৬) স্থচীপত্রে রচয়িতাদের নাম মুদ্রিত হইল।